কিশোর কাহিনী সিরিজ

মতি নন্দী

# কলাবতীর দেখা শোনা

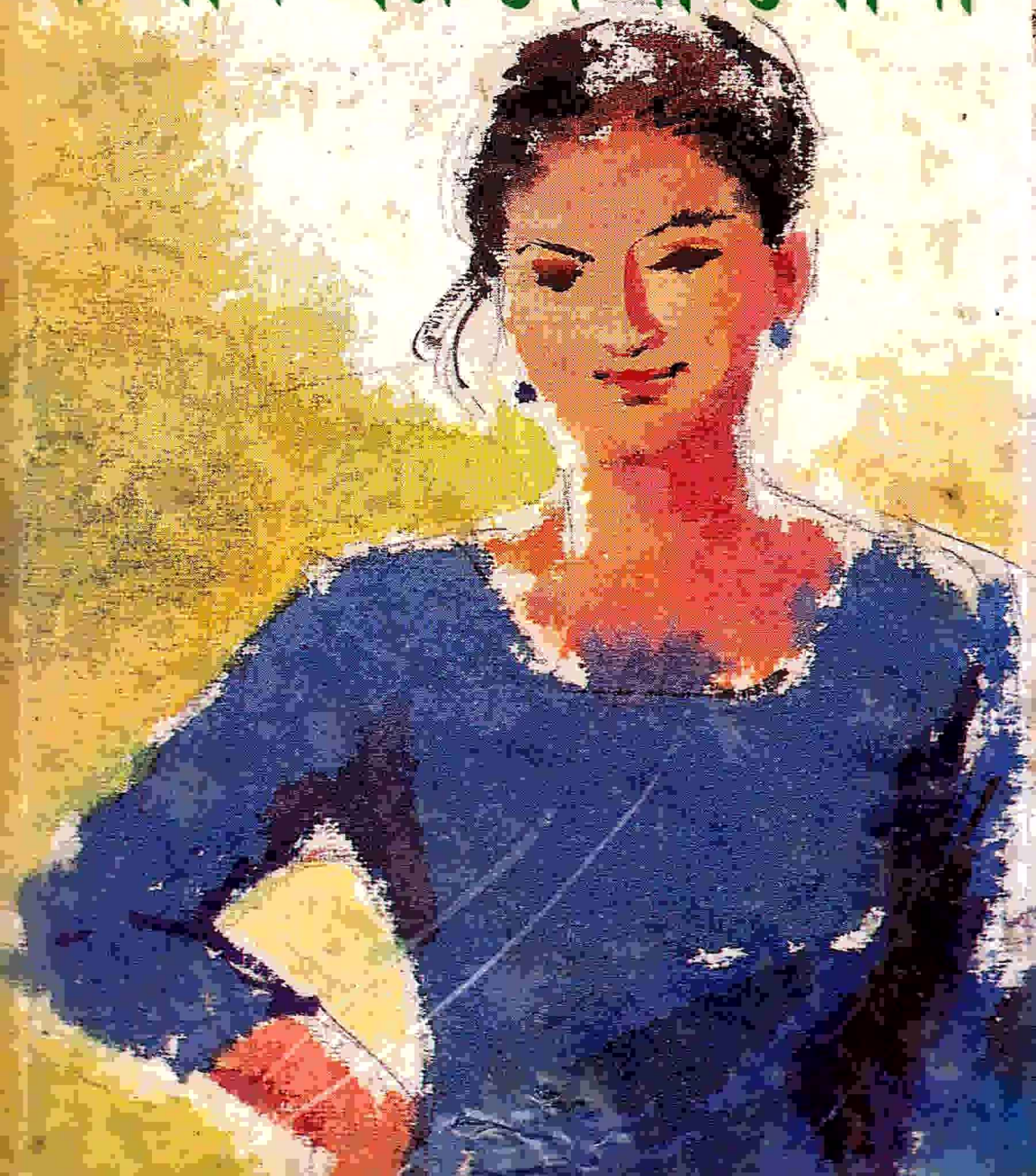

Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex Inc., email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.12.10 09:06:34 +06'00'

কলাবতীর অনেক দিনেরই বাসনা সে খবরের কাগজের খেলার রিপোর্টার হবে।

সে ভাল ক্রিকেট খেলে। বাংলা দলের হয়ে জাতীয় চ্যাম্পিয়ানশিপে খেলেছে। সাংবাদিকরা পৃথিবীর কত জায়গায় গিয়ে ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস, এশিয়ান গেম্‌স, ওলিম্পিক্‌স রিপোর্ট করে। সেইসব বিবরণ পড়তে-পড়তে সে মনে-মনে সেইসব খেলার মাঠে চলে যেত। রিপোর্টাররা কত বড়-বড় খেলোয়াড়ের খেলা কত জায়গায় দেখেছে—টানব্রিজ ওয়েল্‌সে কপিলদেবের ১৭৫ নট আউট কিংবা ওভালে গাওস্করের ২২১, ওলিম্পিক্‌সে কার্ল লুইসের চারটে সোনা, উইম্বলডনে সেলেস আর গ্রাফ, ইংল্যান্ডের চার-পাঁচজনকে কাটিয়ে মারাদোনার গোল, সোল এশিয়ান গেম্‌সে পি টি উষা—ভাবলে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মনে-মনে সে বলত, "আহ্‌হ্‌ আমি যদি তখন ওখানে থাকতাম! টিভি-তে দেখা আর মাঠে বসে দেখায় অনেক তফাত।"

সে জানে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় গিয়ে খেলা দেখার খরচটা প্রচুর। দাদু বা কাকার কাছ থেকে তার শখ

মেটাবার জন্য অত টাকা চাওয়া উচিত নয়। অবশ্য এটাও সে জানে, আটঘরার প্রাক্তন জমিদার তার ঠাকুর্দা রাজশেখর বা অবিবাহিত ব্যারিস্টার কাকা সত্যশেখর মাতৃহীন কলাবতীর কোনও সাধই অপূর্ণ রাখবেন না। কলাবতীর বাবা দিব্যশেখর স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সন্ন্যাস নিয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে গেছেন, তখন দু' বছর মাত্র তাঁর মেয়ের বয়স। পুনেয় মাসির কাছে দশ বছর বয়স পর্যন্ত কাটিয়ে কলাবতী ফিরে আসে পৈতৃক বাড়িতে।

কাঁকুড়গাছি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ে কলাবতী। একদিন তাদের ক্লাসে ইতিহাস পড়াতে-পড়াতে বড়দি, অর্থাৎ হেডমিস্ট্রেস মলয়া মুখার্জি ছাত্রীদের জিজ্ঞেস করেন "বড় হয়ে তোমরা কী হতে চাও ? কী তোমাদের ইচ্ছে ?"

কেউ বলল ডাক্তার হতে চাই, কেউ বলল গায়িকা হতে চাই। এর পর কলকল স্বরে সারা ক্লাস ইচ্ছায়-ইচ্ছায় ভরপুর হয়ে উঠল। পাইলট, হাইকোর্ট জাজ, পুলিশ, ব্যবসায়ী, বিজ্ঞানী, অভিনেত্রী, সমাজসেবিকা, ব্যারিস্টার, এঞ্জিনিয়ার, প্রোফেসারে ক্লাসঘরটা ভরে উঠল। বড়দি জানতে চাইলেন, "কেউ মন্ত্রী হতে চাও না ?" সমবেত স্বরে চিৎকার উঠল, "না, না, না।"

কলাবতীই শুধু চুপচাপ বসে ছিল। বড়দি সেটা লক্ষ করে বললেন, "কালু তুমি ?"

"বড়দি আমি স্পোর্টস রিপোর্টার হতে চাই।"

এ-কথা শুনে সারা ক্লাস অবাক হয়ে গেছল। হওয়ার মতো এত বিষয় থাকতে শেষে কিনা খবরের কাগজের চাকরি !

"স্পোর্টস জার্নালিজ্‌ম তো পুরুষদেরই একচেটিয়া, ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, কলকাতায় যত পপুলার খেলা সেখানে তো পুরুষদেরই প্রাধান্য, মেয়েদের নামই তো কাগজে দেখি না। প্লেয়াররা পুরুষ তাই রিপোর্টাররাও সব পুরুষ, তুমি কি তাদের সঙ্গে



সেখানে কাজ করতে পারবে ?" বড়দি কথাটা বলে মুচকি হাসলেন।

"না পারার কী আছে !" কলাবতী মুচকি হাসিটাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই বলল, "পাইলট কি পুলিশ অফিসার যদি মেয়েরা হতে পারে তা হলে স্পোর্টস রিপোর্টার কেন হতে পারবে না ? তা ছাড়া হচ্ছেও তো। আমিই তো একবার এক মেয়ে রিপোর্টারের সঙ্গে কথা বলেছি।"

"কোন খবরের কাগজের রিপোর্টার ?"

কলাবতী এবার একটু চুপসে গেল। ইতস্তত করে বলল, "খবরের কাগজ নয়, একটা ম্যাগাজিন থেকে মেয়েটিকে পাঠিয়েছিল, সঙ্গে ছিল ফোটোগ্রাফার। বলল, আমাকে নিয়ে ফিচার লিখবে।"

"লিখেছিল ?"

"হ্যাঁ।"

"কই, আমাকে দেখাওনি তো !" মধ্য চল্লিশ, অবিবাহিতা বড়দির স্বরে কিঞ্চিৎ অভিমান। কলাবতী তাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী, নিজের মেয়ের মতোই ওকে শাসন ও ভালবাসা দিয়ে যতটা পারেন ঘিরে থাকেন। যদিও বকদিঘির মুখুজ্জেবাড়ি আটঘরার সিংহীদের কাছে 'শত্রু' বাড়ি, তা সত্ত্বেও মলয়া মুখুজ্জেদের বাগমারির বাড়িতে কলাবতীর অবাধ যাতায়াত তার দশবছর বয়স থেকেই। এই নিয়ে ক্লাসের কেউ-কেউ তাকে ঈর্ষা করে, হাসাহাসিও হয়।

"বড়দি লেখাটা কেন আপনাকে দেখায়নি কালু, আমি সেটা জানি।" কলাবতীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুস্মিতা পট্ করে বলে উঠল।

"না দেখাবার মতো কিছু তাতে আছে নাকি ?"

কলাবতীর কটমট দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে সুস্মিতা বলল, "ওকে

ইন্টারভিউ করেছিল ওদের বাড়িতে, সেখানে তখন ওর দাদু আর কাকাও ছিলেন। তাঁরা ওদের গ্রামের একটা বাৎসরিক ক্রিকেট ম্যাচের কথা তখন সেই রিপোর্টারকে বলেন।"

"হ্যাঁ, আমাদের গ্রাম বকদিঘির সঙ্গে কালুদের গ্রাম আটঘরার মধ্যে সেই ম্যাচ প্রতি বছর হয়। আমি তো সেই খেলা গত বছর দেখেছি।" মলয়া মুখুজ্জে সাধারণ স্বরে কথা বলতে-বলতে হেসে ফেললেন। "তা সেই ম্যাচের কথা উঠল কেন, ওটা তো বয়স্কদের একটা ছেলেমানুষি রাইভাল্‌রি!"

সুস্মিতা বলল, "ওই ম্যাচে কালুদের বংশের তিন পুরুষ—দাদু, কাকা আর নাতনি এক ইনিংসে ব্যাট করে নাকি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছে। কালু ছেলের ছদ্মবেশে ব্যাট করে শেষ মুহূর্তে আটঘরাকে জিতিয়েছিল। তখন আটঘরার একজন ওর ছবি তুলে রেখেছিলেন আর সেটা কালুদের বাড়িতে পাঠিয়ে তিনি জানিয়ে দেন সিংহীরা নিয়ম ভেঙে একটা মেয়েকে খেলিয়ে অন্যায়ভাবে জিতেছে। সুতরাং ম্যাচের রেজাল্ট খারিজ। সেই সঙ্গে ওয়ার্ল্ড রেকর্ডটাও খারিজ।"

বড়দি মুখ টিপে, বড়-বড় চোখ করে সুস্মিতার কথা শুনে যাচ্ছিলেন। সে থামতেই তিনি বললেন, "সেই ছবি যে তুলেছে তার নামটাও কালুর দাদু নিশ্চয় বলেছেন।"

সুস্মিতার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কলাবতী চাপাগলায় বলল, "সুসি খবরদার!"

"সুসি নামটা বল।" একজন সুস্মিতার পিঠে কলমের খোঁচা দিল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নামটা বলে দে।" আর-একজন উসকে দিল।

"থাক-থাক, নাম নিয়ে তোমাদের অত ব্যস্ত হতে হবে না। আমি বলে দিচ্ছি, সেই লোকটা আমিই, যে ছবিটা তুলেছিল।

তাতে হয়েছে কী? পুরুষদের ম্যাচে একটা মেয়েকে না বলেকয়ে খেলালে সেটা তো বেআইনি, ক্রিকেট তো ভদ্রলোকের খেলা।" মলয়া মুখার্জির গলা থেকে শেষবাক্যটি একটু ঝাঁঝ নিয়ে বেরিয়ে এল।

"কিন্তু কালুর দাদু বলেছেন,—" সুস্মিতা নিজেকে সামলে নিয়ে থেমে পড়ল।

"কী বলেছেন?"

"বলেছেন যে—" সুস্মিতা ঢোক গিলল।

"সুসি মেরে ফেলব।" কলাবতী চাপা হুমকি দিল।

"কালু, তুমি চুপ করবে কি?" বড়দি ধমক শেষ করে বললেন, "হ্যাঁ, বলো সুস্মিতা।"

"বলেছেন যে বকদিঘির মুখুজ্জেরা হিংসুটে। ওয়ার্ল্ড রেকর্ডটা সহ্য করতে না পেরে, একটা সাজানো ছবি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছে কালু ওই ম্যাচে খেলেছিল।"

"সাজানো ছবি! আমি সাজানো ছবি তুলেছি?" বড়দি প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি! "এমন মিথ্যে কথা আমার নামে? সুস্মিতা তুমি লেখাটা ঠিকমতো পড়েছ তো? কথাটা কালুর কাকা বলেননি তো?"

"বড়দি।" এতক্ষণে কলাবতী কথা বলল, "বড়দি, দাদু কিন্তু ওই ফিচার-লেখকের কাছে স্বীকার করেছিলেন তাঁর নাতনি ছেলে সেজে খেলেছিল আর সেইজন্যই তিন পুরুষের রেকর্ডটা হতে পেরেছে। দাদুর আপত্তি ছিল, ছবির প্রমাণ দিয়ে রেকর্ডটা খারিজ করার চেষ্টার বিরুদ্ধে। বলেছিলেন, স্পোর্টিং হয়নি। কিন্তু এসব কথা ফিচার-লেখক লেখেননি। তিনি ঝগড়াঝাঁটির কথাই বেশি করে লিখেছেন। 'সাজানো ছবি' এই কথাটা তিনি নিজেই বানিয়ে লিখেছেন। দাদু প্রতিবাদ করে চিঠি দিয়েছিলেন, ছাপেনি।"

"কাগজে তো এখন খেলার বদলে দলাদলি, পলিটিক্স আর মামলার খবরেই ভরা থাকে বলে শুনি। তা কালু, তুমি তো খেলার রিপোর্টার হতে চাও, নিশ্চয় যথার্থ যা দেখবে, শুনবে, বুঝবে সেইসবই লিখবে তো?"

"হ্যাঁ বড়দি।"

সেদিন ক্লাসে এই নিয়ে আর কথা হয়নি। রাত্রে খাবার টেবিলে কলাবতী তার দাদু আর কাকার উপস্থিতিতে ঘোষণার



মতোই বলল, "আমি স্পোর্টস রিপোর্টার হতে চাই।"

এবার পূর্বকথা কিছু জানিয়ে রাখা দরকার। যদিও অনেকেই পুরনো অনেক ঘটনাই জানেন, তা হলেও, স্মৃতি ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য অল্প কথায় আবার বলে নিচ্ছি:

হুগলি জেলায় আটঘরা আর বকদিঘি নামে পাশাপাশি দুটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। দুই গ্রামের দুই জমিদার বংশ, আটঘরার সিংহ আর বকদিঘির মুখুজ্জেদের মধ্যে লর্ড কর্নওয়ালিসের আমল থেকেই শত্রুতার পত্তন। সেটা দুই পুরুষ ধরে খুবই উচ্চস্তরে বজায় ছিল। লাঠালাঠি, ঘর জ্বালানো, খুন করা, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদির পর তাদের ছেলেরা শহর কলকাতায় বিশাল বাড়ি বানিয়ে বসবাস এবং ইংরেজি শিক্ষা, এই দুইয়ের কল্যাণে প্রকাশ্য শত্রুতা ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বন্ধ করে দেয়।

কিন্তু বন্ধ বললেই কি আর বন্ধ হয়! আকচা-আকচি, পায়ে পা লাগিয়ে কলহ, রেষারেষি এসব ব্যাপার অব্যাহত ছিল। অথচ দুই বাড়ির মধ্যে কী যেন একটা পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালবাসা, বন্ধুত্বের অদৃশ্য বন্ধনও ছিল যেটা তারা কিছুতেই প্রকাশ্যে মানত না। ছেলেমানুষের মতো ঝগড়া শুরু করে দেয় সুযোগ পেলেই। সিংহবাড়ির ছেলে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করছে খবর পেয়েই মুখুজ্জেবাড়ির ছেলে রবিবার গির্জায় ছুটল। মুখুজ্জেদের কেউ ওস্তাদ রেখে ধ্রুপদ শিখছে জানামাত্রই সিংহবাড়ির ছেলে ময়দানের ক্রিকেট ক্লাবের মেম্বার হয়ে গেল। জ্ঞানশঙ্কর মুখুজ্জে দুর্গোৎসবে সাতজন সাহেব এনেছিলেন বেনারসের জামিলা বাঈ-এর ঠুমরি শোনাতে। দু' মাস পরেই বলেন্দ্রশেখর সিংহ ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করলেন টাউন ক্লাব মাঠে। বিপক্ষে খেলেছিল এগারোটা সাহেব। তবে একই বছরে উমাশঙ্কর ও সোমেন্দ্রশেখর

রায়বাহাদুর খেতাব পাওয়ায়, দুই বাড়ির শঙ্কর ও শেখররা খুবই মুষড়ে পড়ে কেউ কাউকে টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারায়। ছোটলাটের ওপর এজন্য ওরা খুবই চটে যায়।

বোধ হয় সেইজন্যই ১৯২১-এ গান্ধীজির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুখুজ্জেরা। দেশের নানা দিকে হরতাল, ধর্মঘট, পুলিশের গুলিচালনা, খাজনা বন্ধ আর বিদেশি বস্ত্র পোড়ানো শুরু হল। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু গান্ধীজির এই আন্দোলনের অনেক কিছুই পছন্দ করলেন না। এই দু'জনের সাক্ষাৎ হল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। গান্ধীজি এসেছেন শুনে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল বাড়ির চারধার। গান্ধীভক্তরা ওই সময় ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণে বিলিতি কাপড় পোড়াতে লাগলেন রবীন্দ্রনাথকে উপযুক্তভাবে সমঝিয়ে দেওয়ার জন্য। তার মধ্যে উমাশঙ্করের ছোট ভাই দয়াশঙ্করও ছিল।

এই খবর সিংহবাড়িতে যথাসময়ে পৌঁছল। এক সন্ধ্যায় 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত খদ্দর সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক একটা কবিতা সোমেন্দ্রশেখর পড়ে শোনাচ্ছিলেন বৈঠকখানায়। চরকার সুতো কেটে, বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে স্বরাজ আসবে না, শুধু বক্তৃতাতেও নয়, আসবে বোমা, পিস্তল, আর সন্ত্রাস মারফত, এটাই ছিল কবিতাটির বক্তব্য। শেষে বলা হয়েছে, "বলিস মোদের স্বরাজ সাধনা।/ অশনে বসনে বন্ধ নয়,/গোলাগুলি বোমা ইহারো উপরে/খাঁটি বেদান্ত ইহাতে রয়।" পড়া শেষ করে তিনি সতেরো বছরের বড়ছেলে গুণশেখরকে জিজ্ঞেস করেন, "বুঝলে কিছু?" ছেলেটি মাথা হেলায় এবং অচিরেই জানা গেল সে অনুশীলন পার্টিতে যোগ দিয়েছে।

এর কয়েক মাস পর এক বিকেলে বারান্দায় বসে উমাশঙ্কর মানিকতলা ব্রিজের দিক থেকে বোমা পড়ার দুটো এবং রাইফেলের



তিনটে আওয়াজ পেলেন। ভাই দয়াশঙ্করকে বললেন, "খোঁজ নিয়ে দ্যাখ তো।" সন্ধের সময় দয়াশঙ্কর পাংশু মুখে দাদাকে জানাল, "পুলিশের ডি সি ব্ল্যাক ওয়াটার্সের গাড়িতে বোমা মেরেছে গুণশেখর। পুলিশের গুলি ওর পেটে ঢুকেছে, সেই অবস্থায় দৌড়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে আমাদের বাগানে নামে।"

উমাশঙ্কর প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন, "সোমের ছেলেটা এখন কোথায়?"

"আমার শোবার ঘরে।"

"দরজাটা বন্ধ করে রাখ। কেউ দেখেছে?"

"অনুকূল আর ভোঁদার মা।" অর্থাৎ মালী এবং দিনরাতের কাজের বউ।

"ওদের বলে দে, কারও পেট থেকে পুলিশ যদি একটা কথাও বের করে," দোনলা বন্দুকটা দেওয়াল থেকে পেড়ে উমাশঙ্কর জানিয়ে দেন, "তা হলে দুটো গুলি দুটো পেটে ঢুকবে।"

পুলিশ খোঁজ করতে-করতে মুখুজ্জেবাড়িতেও আসে।

"কী বলছেন দারোগাবাবু, এই গান্ধীবাদী বাড়িতে লুকোবে টেররিস্ট! ধরতে পারলে আমি নিজে গিয়ে আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে আসব। সরকার বাহাদুর কি অমনি-অমনি রায়বাহাদুর খেতাবটা দিয়েছেন?.... ডি সি সাহেব বেঁচে গেছেন তো!"

ডি সি সাহেব মারা যাননি। উমাশঙ্কর অতঃপর তাঁর বাল্যবন্ধু এক ডাক্তারকে ডাকিয়ে এনে বাড়িতেই গুণশেখরের পেট থেকে গুলি বের করান। তিন সপ্তাহ পর এক রাত্রে শাড়ি-পরা ঘোমটা দেওয়া গুণশেখরকে ব্রুহামে চড়িয়ে সিংহবাড়িতে গিয়ে সোমশেখরের হাতে তুলে দিয়ে বলে আসেন, "শুধু হ্বস আর রোড্‌সের রানের, উইকেটের খবর রাখলেই কি চলবে, গানবাজনার চর্চা একটু কর। ছেলেটা যে গোল্লায় যাচ্ছে সেদিকে একটু নজর

দে।" মাসছয়েক পর গুণশেখর বোম্বাই থেকে জাহাজে ইংল্যান্ড পাড়ি দেয় ব্যারিস্টার হয়ে আসার জন্য। কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি। বিয়ে করে ওখানেই বসবাস ও ব্যবসা শুরু করে দেয়।

রানিগঞ্জে কয়লাখনি নিলামে চড়বে বলে আচমকা একদিন উমাশঙ্করের কাছে নোটিস এল। মাথায় হাত দিয়ে তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন। এই মুহূর্তে নগদ অত টাকা তাঁর হাতে নেই। খনির সবকিছু দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা ম্যানেজারকে তিনি খুবই বিশ্বাস করতেন। উমাশঙ্কর রানিগঞ্জে গত পাঁচ বছরে দু'বার মাত্র গেছেন। তিনি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি, তলায়-তলায় ম্যানেজারটি টাকা সরিয়ে এবং ঋণের জালে খনিটিকে জড়িয়ে দিয়ে সটকান দিয়েছে। আগামীকালের মধ্যে চল্লিশ হাজার টাকা শোধ না করলে খনি হাতছাড়া হয়ে যাবে।

খবরটা সেইদিনই কিভাবে যেন পৌঁছে গেল সিংহীবাড়িতে। একটু বেশিরাতেই সোমশেখরের ফোর্ড গাড়িটা থামল মুখুজ্জেবাড়ির পোর্টিকোয়। শয্যা-নেওয়া উমাশঙ্কর খবর পেয়ে নীচের বৈঠকখানায় নেমে আসতেই কোনও ভূমিকা না করে সোমশেখর একটা গয়নার বাক্স টেবিলে রেখে বললেন, "এটা তোর বউঠানের, পাঠিয়ে দিল। সোনা, জড়োয়া সব মিলিয়ে ষাট হাজার টাকার তো হবেই। কাল সক্কালেই জোড়াবাগানে গিয়ে হরি পালের গদিতে এগুলো বন্ধক রেখে টাকা নিবি, তারপর সোজা রানিগঞ্জ দৌড়বি। আমার গাড়িটা ড্রাইভার সমেত রেখে যাচ্ছি।" উমাশঙ্কর কুণ্ঠিতভাবে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, দাবড়ানি দিয়ে থামিয়ে সোমশেখর বলে ওঠেন, "শুধু আবদুল করিম আর হাফেজ আলির তানকারি লয়কারি নিয়েই কি চলবে? লেটকাট, গ্লান্স কী জিনিস সেটাও একটু বোঝার চেষ্টা কর।"

এঁদেরই দুই পুত্র রাজশেখর ও হরিশঙ্কর দুই বংশের রেষারেষির



ঐতিহ্য আজও বহাল রেখেছেন এবং যথারীতি একজন তাঁর পুত্র সতু অর্থাৎ সত্যশেখর, অন্যজন তাঁর কন্যা মলু অর্থাৎ মলয়ার মধ্যে এই বিচিত্র শত্রুতার ধারাটি সফলভাবে প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়েছেন। রেষারেষিটা বকদিঘি ও আটঘরা গ্রামের মধ্যেও ছড়িয়ে যায় যখন এই দুই পরিবারের উদ্যোগে 'হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে' নিয়মে একটা বাৎসরিক ক্রিকেট ম্যাচ চালু হয়। গত বছর আটঘরার ওপর দায়িত্ব পড়েছিল ম্যাচ অনুষ্ঠানের। সেই ম্যাচে নিয়ম লঙ্ঘন করে কলাবতী ব্যাট করেছিল ছেলের বেশ ধরে। এবং তার ব্যাটিংয়ের জন্যই আটঘরা ম্যাচটা জেতে। ব্যাট করার একটা সময়ে হুক করতে গিয়ে তার মাথা থেকে পানামা হ্যাটটা পড়ে যায় আর মলয়া ঠিক তখনই তার ছবিটা তুলে নেন। সেই ছবিতেই পরিষ্কার ধরা পড়ে ব্যাটস্ম্যানটি আসলে ব্যাটস্‌উওম্যান কলাবতী।

এইসবই হল পেছনের কাহিনী। স্কুলের ক্লাসে ওই ম্যাচটার কথা সুস্মিতা খুঁচিয়ে তোলার পর থেকেই বড়দির বিব্রত মুখটা আর ওই কথাগুলো— "সাজানো ছবি! আমি সাজানো ছবি তুলেছি? এমন মিথ্যে কথা আমার নামে?" বারবার ঘুরে আসছিল কলাবতীর মনে। সে তামা-তুলসী ছুঁয়ে বলতে পারে দাদু ওই কথা বলেননি। বড়দিকে তিনি খুবই স্নেহ করেন। দুই বাড়ির মধ্যে যতই আকচা-আকচি থাকুক রাজশেখর সিংহ এমন অভিযোগ মুখুজ্জেবাড়ির মেয়ে সম্পর্কে কখনওই করবেন না। কথাগুলো সম্পূর্ণ বানিয়ে লিখেছে সেই ফিচার-লেখিকা, যার নাম দেবরিনা সেন। বস্তুত স্পোর্টস রিপোর্টার হওয়ার ইচ্ছাটা কলাবতীর মধ্যে উসকে দিয়েছিল দাদুর মুখে বসিয়ে দেওয়া "একটা সাজানো ছবি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছে" কথাটা। সে লেখাটা পড়েই ঠিক

করে আসল সাংবাদিকতা কাকে বলে দেখিয়ে দেবে দেবরিনা সেনদের, অবশ্য যদি সুযোগ পায়। আর সেই রাতেই খাওয়ার টেবিলে সে ঘোষণা করল, "আমি স্পোর্টস রিপোর্টার হতে চাই।"

রাজশেখর ও সত্যশেখরকে হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকতে দেখে কলাবতী মৃদুস্বরে বলল, "আজ স্কুলে কী লজ্জায় যে পড়তে হল! সুস্মিতা বড়দিকে সব বলে দিয়েছে।"

"কী বলে দিয়েছে?" সত্যশেখর জানতে চাইলেন।

"সেই 'ক্রিকেটের কলাবতী' লেখাটার কথা।" অপরাধীর মতো গলায় কলাবতী বলল।

"বলেছে তো কী হয়েছে?"

"সাজানো ছবি শুনে বড়দি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন।"

"আহহ্, মনে আঘাত পাওয়ার মতোই তো কথাটা।" রাজশেখর সহানুভূতি আর মমতা মেশালেন কথাগুলোয়। "তুই বলেছিস তো ওসব কথা আমি বলিনি।"

কলাবতী ঘাড় নাড়ল।

"ব্যস, তা হলে তো ব্যাপারটা চুকেই গেল।" সত্যশেখর উৎসুক চোখে খাবারের ট্রে হাতে প্রবেশ করা মুরারির দিকে তাকিয়ে বললেন।

"না চোকেনি।" রাজশেখর কঠিন স্বরে ছেলেকে ধমক দিলেন। "মলয়া কেঁদে ফেলেছে যখন—"



"কেঁদেছে কোথায়! কালু বলল না, প্রায় কেঁদে ফেলেছিল। 'প্রায়' শব্দটা লক্ষ করো।" সত্যশেখর সওয়াল করার ভঙ্গিতে আঙুল দিয়ে 'প্রায়'-কে খোঁচা দিলেন।

রাজশেখর চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। "এখনই একটা চিঠি লিখব মলয়াকে। কালু, তুমি কাল ফার্স্ট পিরিয়ডের আগেই ওকে চিঠিটা দেবে।"

"খেয়ে উঠেই বরং তুমি লিখো, অত তাড়া কিসের।" সত্যশেখর বললেন, "কালু আর একটা যে কথা বলল সেটা কি শুনেছ? স্পোর্টস রিপোর্টার না কী যেন হবে বলল।"

রাজশেখর চেয়ারে আবার বসে পড়লেন। গলাখাঁকারি দিয়ে একটা রুটি প্লেট থেকে তুলে কেমন সেঁকা হয়েছে তাই পরীক্ষা করতে-করতে বললেন, "এদেশে মেয়েরা স্পোর্টস রিপোর্টার হয় না। জলসার হয়, রাজনীতির হয়, সিনেমা, ফ্যাশন, ছবির এগজিবিশন, ধর্মসভা, সাহিত্যসভা সব কিছুরই মেয়ে রিপোর্টার হয়, কিন্তু খেলার হয় না।"

"ঠিক, হান্ড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট।" সত্যশেখর রুটির টুকরো ডালের বাটিতে ডোবালেন। "কোনও মেয়েকে ফুটবল ম্যাচ রিপোর্ট করতে দেখেছিস, কোনও মেয়ের লেখা ক্রিকেট ম্যাচের রিপোর্ট পড়েছিস? অ্যাথলেটিক্স, সুইমিং, টেনিস, শুটিং, কিত্‌কিত্, বক্সিং, ওয়েট লিফটিং—"

রাজশেখর হাত তুলে ছেলেকে থামালেন। "সতু আর তোমাকে লিস্টি পড়তে হবে না। খেলা আর খেলোয়াড় সম্পর্কে আগের সেই ধ্যানধারণা এখন তো আর নেই। এখন কাগজ খুললেই ক্লাবের সঙ্গে প্লেয়ারদের টাকা-পয়সা নিয়ে ঝগড়া, বাকি টাকা না পেলে ওরা পায়ে বল ছোঁয় না। তার ওপর আছে প্লেয়ারের সঙ্গে কোচের মন কষাকষি, খেলার মধ্যেই রেফারির

কানধরা, তাঁকে লাথি মারা এইসবই তো পড়তে হয়।"

"শুধু কি তাই? দাঙ্গাহাঙ্গামার কথাটাও বলো। ইট ছোড়া, গ্যালারি আর টেন্টে আগুন, ক্ষুর মারা, ব্লেড চালানো!"

"সতু, আর বলার দরকার নেই। কালু এতক্ষণ তো সব শুনলে খেলাধুলোর হাল যেখানে অমন, তখন একটা মেয়েকে আমি রিপোর্টারি করতে পাঠাতে পারি কি?"

কলাবতী মুখ নামিয়ে খেয়ে যাচ্ছে আর কী যেন ভেবে চলেছে। হঠাৎ একচিলতে হাসি তার ঠোঁটে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। চিন্তিত মুখে সে বলল, "বড়দিও আজ ঠিক তোমাদের কথাগুলোই বললেন।"

ওঁরা দু'জনেই খাওয়া থামিয়ে সচকিতে তাকালেন। প্রথমে সত্যশেখর বললেন, "মলয়া তোকে মাঠে যেতে বারণ করেছে?" তারপর রাজশেখর বললেন, "মুখুজ্জেদের মেয়ে খেলার মাঠের বোঝেটা কী?"

"জানি না বোঝে কি না-বোঝে, তবে বড়দি স্পোর্টস নিয়ে মেয়েদের লেখালেখি যে একদমই পছন্দ করেন না সেটা খুব ভাল ভাবে আজ জানিয়ে দিয়েছেন। বললেন, 'দেখো তোমার দাদু আর কাকাও আমার সঙ্গে একমত হবেন।' এখন দেখছি বড়দির কথাই ঠিক।"

"ঠিক! ওর সঙ্গে আমরা একমত? মুখুজ্জেদের মেয়ে যা বলবে আমরাও তাই বলব?" রাজশেখর হাতের রুটিটা একটানে দু' টুকরো করে আবার সেটা চার টুকরো করলেন।

"মলয়া কি মনে করে মুখুজ্জেরা কাওয়ার্ড বলে সিংহীরাও কাওয়ার্ড? ইট মারে, ক্ষুর চালায় বলে সিংহীদের মেয়ে ভয়ে মাঠে যাবে না?" সত্যশেখর তাঁর বাবার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন।

"মুখুজ্জেবাড়ির মেয়ে পছন্দ করে না বলে সিংহীবাড়ির মেয়ে মাঠে গিয়ে রিপোর্টিং করবে না,তাই কখনও হয়? কালু তোমার ফাইনাল পরীক্ষাটা শেষ হোক, তারপর দেখি 'বঙ্গবাণী'-তে কিছু একটা ব্যবস্থা করা যায় কিনা।" কথাটা বলেই রাজশেখর আলু-কপির ডালনায় মনোনিবেশ করলেন।

"বঙ্গবাণী? বাংলা কাগজ কেন? 'স্টেটস্‌ম্যান' বা 'টেলিগ্রাফ' নয় কেন? কালু তো ইংরিজি লিখতে পারে।" সত্যশেখর উত্তেজিত হয়ে আঙুলে লাগা ঝোল চাটতে শুরু করলেন।

"সতু আঙুল চাটা বন্ধ করো।... ইংরিজি কাগজে লেখাটা

চাট্টিখানি কথা নয়। নেসফিল্ড গুলে না খেলে নির্ভুল ইংরিজি লেখা যায় না। কালুদের স্কুলে কার লেখা যেন গ্রামার পড়ায়, নেসফিল্ডের যে নয়, তা আমি জানি।"

"মুখুজ্জেদের মেয়ে যে-স্কুলের হেডমিস্ট্রেস সেখানে নেসফিল্ড আশা করা যায় না। মলয়া তো একলাইন ইংরিজিও লিখতে পারে না।" সত্যশেখর চাটার জন্য আঙুলটা মুখের কাছে এনেই নামিয়ে নিলেন।

"কাকা, তুমি একবার আমায় বলেছিলে—"

"কী বলেছিলুম?" সত্যশেখর সন্ত্রস্ত হয়ে ভাইঝির দিকে তাকালেন। কলাবতী মুখ টিপে হাসছে দেখে তিনি আরও ঘাবড়ে গেলেন।

"বলব দাদুকে?"

"বল না।" সত্যশেখর চেয়ারে খাড়া হয়ে বসে থুতনি তুলে চ্যালেঞ্জ জানাবার ভঙ্গিতে আবার বললেন, "বল কী বলবি।"

"জানো দাদু বিলেতে থাকার সময় 'লন্ডন টাইমস্'-এ একটা চিঠি ছাপাবে বলে, চিঠিটা লিখে কাকা প্রথমে সেটা বড়দিকে পড়তে দিয়েছিল। কাকা নিজে আমায় এ-কথা বলেছে।"

"কেন?" রাজশেখরের স্বরে বজ্রনির্ঘোষ। সত্যশেখরের খাড়া শরীর তার ফলে নুয়ে পড়ল। চল্লিশের ওপর বয়স হলেও বাবার কাছে তিনি এখনও বালক।

"উত্তর দাও সতু।"

"মানে খুব তাড়াহুড়োয় লিখেছিলাম তো। হয়তো ইংরিজির ভুলটুল থেকে যেতে পারে, তাই আর-একজনকে দিয়ে—"

"হরির মেয়েকে দিয়ে তাই ইংরিজি কারেকশন করিয়েছ! আর কোনও লোক পেলে না? শেষে কিনা হরির মেয়ে, উফ্‌ফ্! তোমাকে বিলেত পাঠানোটাই আমার বোকামি হয়েছে।"



বোধ হয় জীবনে এই প্রথম রাজশেখর স্বীকার করলেন তাঁর বোকামির কথা। কিন্তু পঁচিশ বছর আগে যখন তিনি খবর পান হরিশঙ্করের মেয়ে উচ্চশিক্ষার্থে ইংল্যান্ড যাচ্ছে, তখন উত্তেজনায় তাঁর কেশর ফুলে ওঠে। ওদের মেয়ে বিলেতে যাবে আর সিংহীবাড়ির ছেলে শুধুই এম এ, এল এল বি হয়ে ওকালতি করবে? হতেই পারে না। মলয়ার এক মাস পরই সত্যশেখর হিথরো এয়ারপোর্টে নামেন ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য। যে-কথাটা তিনি এখনও পর্যন্ত কাউকে বলেননি, এমনকী কলাবতীকেও নয়, তাঁর চিঠি পেয়ে হিথরোয় কিন্তু অপেক্ষা করছিলেন মুখুজ্জেবাড়ির মেয়েটিই।

"সতু, তোমাকে ব্যারিস্টার হতে বিলেত পাঠিয়েছিলুম, চিঠি লেখার জন্য নয়। হরির পয়সায় মলয়া গিয়েছিল ডক্টরেট করতে, চিঠি কারেকশন করে দেওয়ার জন্য নয়।"

"আজ্ঞে, আমরা দু'জনেই তো—"

"পাশ করেছ, থিসিস লিখেছ, ব্যস, তা হলেই ল্যাঠা চুকে গেল। তুমি হরির মেয়েকে দিয়ে ইংরিজি ঠিক করিয়েছ, নিশ্চয় এটা হরি জেনেছে, নির্ঘাৎ ও বলে বেড়িয়েছে সিংহীরা মুখ্যু। উফ্‌ফ্।"

"দাদু, ওসব তো কুড়ি-পঁচিশ বছর আগের কথা। এই নিয়ে এখন আবার প্রবলেমে পড়ছ কেন?" কলাবতী তার দাদুর আহত মর্যাদায় প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করল।

সারা ঘর অতঃপর চুপ। কলাবতী ভাবতে লাগল, বঙ্গবাণী-তে দাদু কীভাবে ব্যবস্থাটা করবেন? অনেক গণ্যমান্য বিশিষ্ট লোকেদের সঙ্গে দাদুর চেনাজানা আছে, হয়তো বঙ্গবাণীর সম্পাদকের সঙ্গেও আছে।

"সতু, তোমার চিঠির বিষয়টা কী ছিল?"

"বেড়ালের ডাক, মানে বেড়ালদের ঝগড়া।"

"কী বললে!" রাজশেখর চামচে দই তুলে মুখের দিকে আনছিলেন, সেটা প্লেটের ওপর পড়ে ছিটকে গেল।

"বেড়ালেরা এমন ঝগড়া শুরু করত যে, রাতে ঘুমোতে পারতুম না।" সত্যশেখরের কাঁচুমাচু মুখ আরও অবনত হল।

"তা মলয়া তোমার চিঠিটাকে কী করল?"

"ধুয়েমুছে এমন সাফ করে দিল যে, চিঠির বক্তব্যই বদলে গেল। আমি খুব বিনীতভাবেই বলেছিলাম রাত্তিরে বেড়ালদের ঘরে বেঁধে রাখলে ভাল হয়। টেন্‌স, সিনট্যাক্স, প্রিপোজিশন, একটা ভুলও মলয়া বের করতে পারেনি। ও কিন্তু চিঠিটার বক্তব্যকে ঘুরিয়ে, সাহেবদের বেড়াল পোষার ওপর কষে গালাগাল দিয়ে চিঠিটাকে একেবারে উলটে দিল।"

"গালাগাল···হরিরই মেয়ে তো, এসবে পোক্ত তো হবেই।" রাজশেখরকে কিঞ্চিৎ নরম দেখাল। আয়েসি গলায় জানতে চাইলেন, "কী লিখেছিল মেয়েটা?"

ইতস্তত করে সত্যশেখর বললেন, "এত বছর আগের কথা তো ঠিকঠাক মনে নেই। তবে বেড়ালদের ওপর একটা থিসিসের মতো হয়েছিল। প্রমাণ করতে চেয়েছিল লন্ডনের বেড়ালরা কলকাতার বেড়ালদের থেকে বেশি অসভ্য, বেশি বোকা, বেশি ঝগড়ুটে। চিঠিটা বেশ বড় হয়েছিল, কিন্তু পুরোটাই ছেপেছিল, কুকুর-বেড়ালদের জন্য ওরা কাগজে জায়গা দেয়।"

"দেবেই তো, ইংরেজরা সভ্য জাত! চিঠির রিঅ্যাকশন কিছু হয়েছিল?"

"হবে না মানে! আমাকে ডবল গালাগাল দিয়ে চারদিন ধরে চিঠি বেরোল। তার কী ভাষা! পারলে আমাকে আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে খায় আর কি!" সত্যশেখর শিউরে উঠলেন পঁচিশ বছর



পর।

"হরির মেয়ে তো সিংহীদের গালাগাল খাওয়াল। কালু আমি তোমায় একটা চিঠি লিখে দেব, সদানন্দকে গিয়ে দেবে।"

"কে সদানন্দ?" কলাবতী জিজ্ঞেস করল।

"বঙ্গবাণীর মালিক।" রাজশেখর চেয়ার থেকে উঠে ঘরের কোণে বেসিনে গিয়ে দাঁড়ালেন। "সদানন্দর বাবা শ্যামানন্দ কাব্যতীর্থ আটঘরা স্কুলে বাংলা পড়াতেন, আমি পড়েছি ওঁর কাছে। স্কুলে আমার থেকে পাঁচ ক্লাস নীচে পড়ত সদানন্দ, খবরের কাগজ বের করল। একদিন আমার কাছে ছুটে এল। ব্যাপার কী? এখনই দশ হাজার টাকা ধার না মেটালে কাগজওলা ওকে আর কাগজ দেবে না। আমায় টোপ দিয়ে বলল টু পারসেন্ট সুদও দেবে। আমি অবশ্য সুদটুদ নিয়ে কাউকে ধার দিই না। সে প্রায় হাতে-পায়ে ধরাধরি, টাকা না পেলে কাল তা হলে কাগজ বের করতে পারবে না। দিলাম টাকা।"

"টাকাটা শোধ দিয়েছে?" সত্যশেখর কৌতূহল দেখালেন।

"দিয়েছে এগারো বছরে তিন খেপে।"

"আর সুদ?" কলাবতী জানতে চাইল।

রাজশেখর সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে বললেন, "সেটাই তো এবার আদায় করব। একটা চিঠি লিখে দেব, তুমি সেটা নিয়ে সদানন্দর সঙ্গে দেখা করবে।"

"আমিও কালুর সঙ্গে যাব।" সত্যশেখর তাঁর কাঁচাপাকা চুলের মধ্যে বাঁ হাতটা বুলিয়ে দইমাখা একটা আঙুল চাটার জন্য মুখে ঢোকালেন।

"সতু!" একটা বজ্রনির্ঘোষ গড়িয়ে এল সত্যশেখরের দিকে। আঙুলটা মুখ থেকে পড়ে গেল। "তুমি কেন ওর সঙ্গে যাবে? যে রিপোর্টার হতে চায় তাকে একাই সবকিছু সামাল দিতে হয়।

সাংবাদিকতা হল ফ্রিজে দাঁড়িয়ে ব্যাট করার মতো। এগারোজন লোক তোমাকে হারাতে চায়··· এগারোটা কাগজের লোক শেয়ালের মতো ঘুরছে ছোঁ মেরে খবর তুলে নেওয়ার জন্য। কখন গুগলিটা তোমাকে ব্যাট-প্যাড ক্যাচ তোলাবে, শর্ট লেগ সেজন্য অপেক্ষা করে আছে। টাফ ওয়ার্ল্ড, ভেরি কম্পিটিটিভ এই নিউজপেপার ওয়ার্ল্ড।"

"তার ওপর স্পোর্টস রিপোর্টিংটা একেবারেই পুরুষদের জগৎ।" সত্যশেখর কথাটা মনে করিয়ে দিলেন।

"বড়দিও তাই বললেন। পুরুষ প্লেয়ার, পুরুষ অফিসিয়াল, পুরুষ দর্শক, পুরুষ রিপোর্টার, আমি সেখানে কি কাজ করতে পারব?"

"মলয়া একটা সবজান্তা। তুই পারবি কি পারবি না সেটা ও জেনে বসে আছে! আলবাৎ পারবি।" সত্যশেখরকে একটু বেশিই ক্রোধান্বিত দেখাল। "তুই একাই চিঠি নিয়ে বঙ্গবাণীতে সদানন্দ কাব্যতীর্থের কাছে যাবি।"

"কাকা, সদানন্দ নয়, ওঁর বাবা ছিলেন কাব্যতীর্থ। ইনি ঘোষ।"

ফাইনাল পরীক্ষার পর এক সন্ধ্যায় কলাবতী তার কাকার মোটর থেকে নামল বঙ্গবাণীর ফটকের সামনে।

"কালু, আমি ওই রোল-এর গাড়িটার ধারে পার্ক করে অপেক্ষা করছি, কতক্ষণ আর লাগবে, মিনিট পনেরো?" সত্যশেখর ধীরে তাঁর ফিয়াটটা চালিয়ে এগিয়ে গেলেন।

ফটক থেকে সোজা পথ। ডান দিকে ফাঁকা জায়গায় কিছু মোটর আর মোটরবাইক। বাড়িটা বাঁ দিকে। মাঝারি আকারের কাঠের পাল্লার দরজা দিয়ে সিমেন্টের একটা গলিতে ঢুকে কলাবতী বিভ্রান্ত হল। বড়-বড় কাগজের রিল, গলিটা প্রায় বন্ধ। দুটো



মানুষ যাওয়ার মতো ফাঁক। একটি লোক ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসতে সে বলল, "বঙ্গবাণীর সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করব, কোন দিক দিয়ে যাব বলুন তো?"

"এই তো সোজা গেলেই সিঁড়ি, তিনতলায় ওঁর ঘর।" লোকটি হাত তুলে কাগজের রিলের ফাঁকটা দেখিয়ে চলে গেল।

একটু দমে গেল কলাবতীর উদ্দীপনা ও উৎসাহ। বঙ্গবাণীর বাড়িতে প্রথম পা দিয়েই, ঘিঞ্জি, সরু, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ খবরের কাগজের অফিস সম্পর্কে তার কল্পনাকে ধাক্কা দিল। তার ধারণা ছিল, বাড়িটা ঝকঝকে, তকতকে হবে। রিসেপশনিস্ট সুন্দরী মেয়ে দু-তিনটে টেলিফোন নিয়ে তার জিজ্ঞাসার জবাবে বলবে, 'লিফ্‌টে চারতলায়।'

কিন্তু তার মনে হচ্ছে এখানে বাসা বেঁধে আছে প্রাচীনত্ব। হয়তো এখানকার লোকগুলোও প্রাচীন মনের। তা হলে তো কোনও মেয়েকেই এখানে কাজ দিতে রাজি হবে না। কিছুটা হতাশ হলেও সে ঠিক করল শেষপর্যন্ত চেষ্টা করে যাবে। জিন্‌স আর ব্যাগি শার্টের বদলে সে শাড়ি পরে এসেছে। শেষবার শাড়ি পরেছিল আটঘরার এম. এল. এ. গোপীনাথ ঘোষের বড় মেয়ের বিয়েতে। সালোয়ার-কামিজ, জিন্‌স বা স্কার্টে সে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, হাঁটাচলার ধরনই তখন বদলে যায়। কিন্তু আজ সে কাকার পরামর্শে পুরোদস্তুর মেয়ে সেজেই, বলা যায়, জেদ নিয়েই বঙ্গবাণীতে এসেছে। তার মনোভাব হল, আমি একটা মেয়ে। তোমাদের কাগজে কাজ করতে বা শিখতে চাই। দিতে হয় দাও, নয়তো চলে যাব।

সিঁড়ির দোতলা অতিক্রম করার সময় সে দেখল একটা ঘরে চারজন লোক একটা টেবিলে মুখোমুখি। দু'জনের হাতে কলম আর লম্বা ফর্দের মতো ছাপা কাগজ। অন্য দু'জনে ধরে রয়েছে

হাতে লেখা কাগজ, যা দেখে তারা পড়ে চলেছে। ঘরের দরজায় কাঠের বোর্ডে লেখা 'রিডিং বিভাগ'।

তিনতলায় পৌঁছে সে দেখল দু'দিকে দুটি ঘর। তাদের মাঝে একটা চওড়া দরজা, যেটা দিয়ে ভেতরের একটা হলঘর দেখা যাচ্ছে। ডান দিকের ঘরের দরজায় কাঠের বোর্ডে লেখা, 'সম্পাদকীয় বিভাগ'। হলঘরের দরজায় লেখা, 'রিপোর্টিং ও বার্তা বিভাগ'। আর বাঁ দিকের ঘরের দরজায় লেখা 'সম্পাদক'। দুই ঘরেরই দরজা খোলা এবং তাতে হ্যান্ডলুমের শস্তার বেডকভারের মতো নীল পরদা ঝুলছে। কলাবতীর মনে হল, পরদাগুলো অন্তত ছ' মাস কাচা হয়নি। সে আর-একটু দমে গেল। এইরকম দৈন্যভরা জায়গায় সে কাজ করবে ও শিখবে বলে এসেছে? বঙ্গবাণীর তো যথেষ্টই টাকা আছে, তবে দৃষ্টিভঙ্গিটা আধুনিক নয় কেন?

তার দরকার সম্পাদকের হাতে একটা চিঠি দেওয়া। সম্পাদকের ঘরের সামনে কোনও বেয়ারা বা পিওনকে দেখতে না পেয়ে সে পরদা সরিয়ে ঢুকে দেখল ঘরের মধ্যেই কাঠের পার্টিশান দিয়ে তৈরি আর-একটা কামরা, যার দেওয়াল ঘষা কাচের। তার বাইরে বসে বিরাট টাক, খদ্দরের সাদা পাঞ্জাবি, মধ্য পঞ্চাশের এক ভদ্রলোক মন দিয়ে কিছু পড়ছেন। ইনিই কি সম্পাদক? বোধ হয়, না। ইতস্তত করে কলাবতী গলাখাঁকারি দিল।

"কী চাই?" মাথা না তুলে তিনি জানতে চাইলেন।

"সদানন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"কেন, কী জন্য?" মাথা না তুলেই আবার প্রশ্ন।

"একটা চিঠি, রাজশেখর সিংহ দিয়েছেন ওঁকে দেওয়ার জন্য।"

"কই, দেখি চিঠিটা।" মাথা না তুলেই হাত বাড়ালেন।



চিঠিটা হাতে পেয়ে মুখ তুলে দেখেই সোজা হয়ে বসলেন। এতক্ষণ গলা শুনেও খেয়াল করেননি, এখন তিনি দেখলেন শাড়িপরা একটি মেয়ে।

"আমি পি এ টু দ্য এডিটর। আপনাকে একটু বসতে হবে। দুটো এডিটোরিয়াল এখন ওঁকে পড়ে শোনাব, অ্যাপ্রুভড হলে কম্পোজে পাঠাব।" তাঁর হাতে ধরা কাগজটা দেখিয়ে পি এ মশাই বললেন, "তারপর দরকার বুঝলে উনি আপনাকে ডাকবেন।"

বাধ্য মেয়ের মতো কলাবতী মাথা নেড়ে বলল, "বেশ।" পি এ মশাই দুটো এডিটোরিয়াল ও চিঠিটা হাতে নিয়ে ঘষা কাচের কামরার সুইংডোর ঠেলে ঢুকলেন এবং বেরিয়ে এলেন তিন মিনিট পর।

"আসুন।" একটু সম্ভ্রম মাখানো ভারী গলায় তিনি কলাবতীকে আমন্ত্রণ জানালেন।

"তুমি রাজশেখরদার নাতনি। বোসো, বোসো।" শ্যামবর্ণ, সিঁথিকাটা কালো চুল, মোটা ফ্রেমের চশমা, চার্লি চ্যাপলিনের 'ভবঘুরে'-মার্কা গোঁফ। সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবি। কলাবতীর মনে হল, দাদুরই বয়সী, তবে চুলে কলপ না দিলেই ভাল হত। বঙ্গবাণীর মালিক হাতের চিঠিটা পতাকার মতো নেড়ে সামনের চেয়ারটা দেখালেন। "তুমি কি জানো আমরা একই স্কুলে পড়েছি? উনি আমার থেকে পাঁচ ক্লাস সিনিয়ার ছিলেন?"

কলাবতী মাথা নেড়ে বলল, "শুনেছি।"

চারদিকে সে চোখ বোলাল। সম্পাদকের ঘরটা এতক্ষণ এই বাড়িতে যা কিছু সে দেখেছে, তার সঙ্গে একেবারেই বেমানান। এই ঘরে কার্পেট, এয়ারকুলার, সোফা, মেহগনির টেবিল, পরদা, ঘুরনি চেয়ার ইত্যাদি দেখতে পাবে একদমই সে আশা করেনি।

"তোমার ঠাকুর্দা আমার বাবার কাছ থেকে যে বাংলা লেখার

তালিম পেয়েছিলেন, তা তো জানতাম না ! এই দ্যাখো চিঠিতে সে-কথা লিখেছেন," চিঠিটা অবশ্য কলাবতীর হাতে তিনি দিলেন না, শুধু পতাকার মতো নাড়লেন। "কিন্তু রাজশেখরদা তো আমায় মুশকিলে ফেলে দিলেন। তোমাকে বাংলা লেখা শেখাবার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন, কিন্তু আমার সময় কোথা ?" সদানন্দ জিজ্ঞাসাটা কলাবতীর জিম্মায় দিয়ে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যে, সে অস্বস্তিতে পড়ে গেল। আমতা-আমতা করে সে বলল, "দাদু খুব আশা করেই আপনার কাছে আমায় পাঠিয়েছেন।"

"তার ওপর আবার স্পোর্টস বিভাগে ! খেলাধুলোর খ-ও আমি জানি না।"

"ও-কথা বলবেন না সদাবাবু।" পি এ মশাই অভিমানী গলায় আপত্তি জানালেন। "এই তো সেদিন, ভারতীয় ফুটবলের মান কী করে তোলা যায়, তাই নিয়ে সেমিনারে বলে এলেন।"

"আহ্হা ওসব কি আমার কথা ?" সদানন্দ সস্নেহে তাঁর পি এ-র দিকে তাকালেন। "ভবনাথই তো পয়েন্টগুলো লিখে দিয়েছিল। আর জানোই তো বক্তৃতাটা আমি ভালই করি। ভবনাথের তৈরি কাঠামোয় আমি খড়-মাটি চাপিয়েছি। আরে বাবা, শিল্ড ফাইনালে শিবদাস বিজয়দাস ভাদুড়ির খেলা তো ছোটবেলায় দেখেছি, সুতরাং বলতে অসুবিধে হবে কেন ?"

"আপনি ভাদুড়ি ব্রাদার্সের খেলা দেখেছেন !" কলাবতী অবাক হয়ে গেল। সে তো আশি বছরেরও আগের কথা ! দাদু ছেলেবেলায় তাঁর বাবা সোমেন্দ্রশেখরের কাছে মোহনবাগানের আই এফ এ শিল্ড জয়ের গল্প শুনেছেন। তখন সদানন্দের তো জন্মাবার কথাই নয় !

"দেখেছি মানে ? সেদিন খেলার পর গড়ের মাঠে যে কী কাণ্ড হয়েছিল কী আর বলব ! আমরা কয়েকজন মিলে তো ঠিকই করে



ফেলেছিলুম কেল্লার ওপর থেকে ইউনিয়ন জ্যাকটা নামিয়ে তেরঙ্গা পতাকা তখনই তুলে দেব।" সদানন্দ চিঠি ধরা হাতটা মাথার ওপর তুলে জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে বললেন, "তখন স্বদেশি যুগ, দেশপ্রেম জিনিসটা ছিল। আর এখন ?" হাতটা নামিয়ে আনলেন সদানন্দ।

কলাবতী হুঁশিয়ার হয়ে গেল। সদানন্দ স্বদেশি যুগে থাকতে ভালবাসেন, বর্তমান যুগকে পছন্দ করেন না। বিষণ্ণ গলায় কলাবতী বলল, "এখন তো করাপশনের যুগ।"

"ঠিক। ঠিক বলেছ।" সদানন্দ উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। "রাজশেখরদার নাতনির মতোই বলেছ। এই দ্যাখো তোমার দাদু লিখেছেন, 'এই বংশের সকলেই, আমি, আমার পুত্র ও একমাত্র পৌত্রী, সকলেই বঙ্গজননীর বাণী শিক্ষা করিয়াছি বঙ্গবাণী হইতেই··· বাংলাটা লক্ষ করো, দারুণ ! হবেই তো, বাবার কাছে স্কুলে তালিম পেয়েছেন যে ! কিন্তু মা, তুমি এখানে কী কাজ শিখবে, তাও আবার স্পোর্টস ! ওখানে তো পুরুষদের রাজত্ব।"

"ডেস্কে বসেও তো কাজ করা যায়।" কলাবতী সতর্কভাবে বলল। সে জানে প্রথমে এই কথা উঠবেই।

"হ্যাঁ, তা অবশ্য যায়। কিন্তু পড়াশোনা শেষ না করেই—"

কলাবতী জানে, এই কথাটাও উঠবে। সে ব্যস্ত হয়ে সদানন্দকে থামিয়ে বলল, "না, না, পড়াশোনা অবশ্যই শেষ করব। পরীক্ষার পর এই দু-তিনমাস কেন শুধু-শুধু বসে থাকা, তাই দাদু বললেন, স্পোর্টস ভালবাসিস, ক্রিকেটও খেলিস, ময়দানটাও তোর অপরিচিত জায়গা নয়। এই সময়টায় তুই বরং সাংবাদিকতায় তালিম নে। বঙ্গবাণীকে তো আর মাইনে দিতে হবে না—"

"বললেন ? মাইনে দিতে হবে না ?" সদানন্দ হাঁফ ছেড়ে

চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। "এই হচ্ছে রাজশেখরদা। টাকাকড়ির ব্যাপারে অত্যন্ত উদার। বাবার কাছে পড়েছেন তো!"

সদানন্দ টেবিলের গায়ে সাঁটা কলিং-বেলের বোতাম টিপলেন। হাফশার্ট-ধুতিপরা বেয়ারা এল।

"ভবনাথবাবুকে ডাকো। জরুরি কাজ।"

বেয়ারা বেরিয়ে যেতেই পি এ মশাই বললেন, "তা হলে শুরু করি?"

অনুমতি পেয়ে তিনি সম্পাদকীয়, যা কালকের কাগজে প্রকাশিত হবে, পড়তে শুরু করলেন। তার প্রথম বাক্য: কলকাতার রাস্তায় পাগলা কুকুরের দৌরাত্ম্য এমনই প্রকট হয়ে উঠেছে যে, গৃহস্থরা নির্ভয়ে রাস্তায় চলাফেরা করতে পারছেন না।

সদানন্দ হাত তুলে পি এ-কে থামিয়ে কলাবতীকে বললেন, "কাল আমাদের চাকরকে একটা কুকুর তাড়া করেছিল। কর্পোরেশনকে কড়কানি দেওয়া দরকার। হ্যাঁ, আপনি পড়ুন।"

পি এ মশাই আবার পড়া শুরু করতে যাবেন তখন একটি লোক প্রায় হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। "আমায় ডাকছেন?"

"বোসো।"

ভদ্রলোকটি বসলেন কলাবতীর পাশের খালি চেয়ারে। সে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল থলথলে ভুঁড়ি, ধুতি-পাঞ্জাবি, চশমা, ঠোঁটের কোণে পানের রস, বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। মাথায় সুগন্ধি তেলের গন্ধ।

"ভব, এই মেয়েটি আমার খুবই পরিচিত, আটঘরার জমিদার, এখন অবশ্য জমিদারি নেই, না থাকলেও বনেদিয়ানা, বংশগৌরব সেসব তো আর চলে যায় না। রাজশেখর সিংহর নাতনি কলাবতী। উনি আমার বাবার ছাত্র ছিলেন, এটাও ওঁর একটা বড় পরিচয়। বাংলা ব্যাকরণ, রচনা সবই বাবা ওঁকে হাতে ধরে



শিখিয়েছেন, আমাকেও। ওর ঠাকুর্দা আমার কাছে পাঠিয়েছেন ওকে বাংলা লেখা আর খেলার ব্যাপারে লেখা শেখার জন্য।"

"বেশ, বেশ, খুব ভাল কথা।" ভবনাথ সামনে-পেছনে দু'বার শরীরটা দোলালেন।

"কিন্তু আমার হাতে সময় কোথায়?"

"তা তো বটেই।" ভবনাথ অনিশ্চিত দৃষ্টিতে সম্পাদকের দিকে তাকালেন।

"তুমিই একে শেখাও।"

"বেশ, বেশ, শেখাব নিশ্চয়, খুকি, তুমি খেলা ভালবাসো? একটু-আধটু খেলেছ তো?"

"বলতে ভুলে গেছি ভব, কলাবতী মেয়েদের ক্রিকেটে বাংলার হয়ে খেলেছে। স্পোর্টস এডিটরের অন্তত ওকে চেনা উচিত।"

ভবনাথের মুখ পলকের জন্য ফ্যাকাসে দেখাল। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে সে খুবই উৎসাহভরে বলে উঠল, "চিনি, খুবই চিনি। গত বছরই তো মেয়েদের রঞ্জি ট্রফিতে সেঞ্চুরি করেছে।"

মেয়েদের রঞ্জি ট্রফি শুনে কলাবতীর যতটা হাসি পেল ততটাই ভয় পেল সেঞ্চুরি করার কথা শুনে। এখনও তার কোনও সেঞ্চুরি নেই। ক্লাব-ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ৮৯ নট আউট। কিন্তু প্রতিবাদ করতে গিয়েও করল না। দরকার কী লোকটিকে অপ্রতিভ করে। চটে থাকলে মুশকিল হতে পারে। ভবনাথ যদি তাকে একটা সেঞ্চুরি পাইয়ে দেনই তাতে কারও কোনও ক্ষতি হবে না।

"সেঞ্চুরিটা কাদের সঙ্গে খেলায় হয়েছিল?" পি এ মশাই অযথাই নাক গলিয়ে প্রশ্নটা করে বসলেন।

কলাবতী ফাঁপরে পড়ে গেল। একটা যে-কোনও রাজ্যের নাম

বলে দেওয়া যায় এবং পাঁচ মিনিট পরই এরা সেটা ভুলে যাবে। তবু লজ্জা করল। নিজের মুখে একটা ডাহা মিথ্যা বলা তার দ্বারা সম্ভব নয়। বিব্রত মুখে সে ভবনাথের দিকে তাকাল।

"গুজরাতের সঙ্গে খেলায়।" ভবনাথের মুখে কোনও বিকার দেখা গেল না।

"ভব, তোমার ডিপার্টমেন্টে কলাবতীকে নিয়ে নাও।" সদানন্দ একটা জটিল সমস্যা মিটিয়ে দেওয়ার মতো গলায় কথাটা বললেন। "আজকাল তো মেয়েরাও মাঠে যাচ্ছে। একে যদি তৈরি করে নিতে পারো, অবশ্য বয়সটা খুবই অল্প, ফুলটাইম কাজ করতে পারবে না। হালকা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দেখতে পারো, এজেন্সি কপির অনুবাদ করাটা শিখিয়ে দিয়ো। ক্রিকেট যখন খেলে তখন ক্রিকেট মাঠেও ওকে পাঠাতে পারো।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। ক্রিকেটারকে ক্রিকেট মাঠেই তো পাঠানো দরকার। ক্রিকেটের টেকনিক্যাল সাইড নিয়ে এখন তো কেউ লেখেই না। শুধুই সাহিত্য আর কাব্য।"

"তা হলে ওকে এখন নিয়ে যাও। সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে একটা প্রাথমিক ধারণা ওকে পাইয়ে দাও।"

"অবশ্য, অবশ্য। এসো কলাবতী।"

ভবনাথের সঙ্গে কলাবতী সম্পাদকের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে 'রিপোর্টিং ও বার্তা বিভাগ' লেখা দরজা দিয়ে হলঘরে ঢুকল। ঘরটায় দুটো ভাগ। বাঁ দিকে সাত-আটটা ছোট টেব্‌লে বসে লিখে চলেছে কয়েকজন। ডান দিকেও তাই। একদিকে সাব এডিটররা, অন্যদিকে রিপোর্টাররা। মেঝেয় স্তূপ করে রাখা খবরের কাগজের ফাইল। দেওয়াল ঘেঁষে কাঠের লকার, স্টিলের আলমারি। দুটো টেলিপ্রিন্টার মেশিন অনর্গল ফটফট শব্দ করে চলেছে। মেশিন থেকে বেরিয়ে আসা টাইপ-করা কাগজ মেঝেয়



লুটিয়ে পড়েছে। একজন বেয়ারা মেশিন থেকে সেটা ছিঁড়ে নিয়ে ছোট-ছোট খণ্ড করতে লাগল। একজন মাঝবয়সী সাব এডিটর চেঁচিয়ে উঠলেন, "ভগীরথ, কপি নিয়ে যা।"

হলঘরের শেষ প্রান্তে একটা বড় টেব্‌লে বার্তা সম্পাদক বসেন। তাঁর সামনে দু'জন লোক খুবই বিনীতভাবে কিছুর যেন ব্যাখ্যা করছে।

রিপোর্টারদের টেব্‌লে দুটো ফোন এবং দুটোই কথা শোনা ও বলায় ব্যস্ত। "শচীনদা, আপনার ফোন," বলে একজন চেঁচিয়ে ডাকল।

চলতে-চলতে একঝলকে যতটুকু দেখা যায়, কলাবতী দেখে নিল।

খেলার বিভাগটা রিপোর্টিং বিভাগের পেছনে জানলার ধারে। একটা বড় গোলাকার কাঠের টেব্‌ল। তিনজন লোক বসে। ভবনাথের সঙ্গে একটি মেয়েকে দেখে জিজ্ঞাসু কৌতূহলী চোখে তারা তাকাল। টেব্‌লে টেলিফোন, নিউজপ্রিন্টের প্যাড, পিন দিয়ে গুচ্ছ করা টেলিপ্রিন্টার কপি এবং প্রায় এক বিঘত লম্বা তলায় কাঠের চাকতি দেওয়া দুটো সরু লোহা, যাতে গাঁথা রয়েছে বাতিল বা অনুবাদ হওয়া কপি। দুটো ফাইল বক্স। তার ওপর একটা বাঁধানো হাজিরা খাতা। পেপার ওয়েট, পিন কুশন ইত্যাদি।

"পরেশ, সি এ বি-র প্রেস কনফারেন্স থেকে বলদেব এখনও ফেরেনি?" ভবনাথ উদ্বিগ্ন চোখে জিজ্ঞেস করল।

"না।" হাওয়াই শার্ট পরা, গোলগাল, বেঁটে, বাঁ হাতে পাথর লাগানো তিনটি আংটি পরা পরেশ প্যাড থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে তাতে নাক ঝাড়তে লাগল।

"বলদেব গেছে তো?"

"কাল বলেছিল বাড়ি থেকে সোজা সি এ বি-তে চলে যাবে। গেছে কিনা জানি না।" পরেশ কাগজটা দলা পাকিয়ে টেব্‌লের নীচে ছুড়ে দিল।

"মুশকিলে ফেলল দেখছি। ওহ্‌হ্‌ কলাবতী, দাঁড়িয়ে কেন, বোসো।" ভবনাথ দুশ্চিন্তা ঝেড়ে তিনজনের কৌতূহল মেটাতে উদ্যোগী হল।

"এর নাম কলাবতী সিংহ, ক্রিকেটে বেঙ্গল প্লেয়ার। সেঞ্চুরি-টেঞ্চুরি আছে। সদাবাবুর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাতনি।"

ভবনাথ একটু জোর দিল শেষ বাক্যটিতে। "সদাবাবুর বাবার কাছে এর ঠাকুর্দা বাংলা শিখেছেন। মানে এরা অবাঙালি সিংহ নয়, বাঙালিই। বাংলা শিখেছেন মানে বিশুদ্ধভাবে প্রাঞ্জল গদ্যে বাংলায় ভাবপ্রকাশ করাটা শিখেছেন। তিনি একে সদাবাবুর কাছে পাঠিয়েছেন স্পোর্টস জার্নালিস্ট করার জন্য।"

ভবনাথ তার কথার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য থামল। উদাসীন তিনজোড়া চোখ কলাবতীর মুখে নিবদ্ধ। কলাবতী অস্বস্তিতে।

গলা নামিয়ে ভবনাথ বলল, "সদাবাবু এ-ব্যাপারে খুবই উৎসাহ দেখালেন। বললেন, খেলার বিভাগই সেরা জায়গা গদ্য শেখার জন্য।"

তিনজোড়া চোখের উদাসীনতা নিমেষে ঘুচে উদ্দীপনা ফুটে উঠল।

"এ তো খুবই ভাল কথা ভবদা। আমরা সব শিখিয়ে দেব।" পরেশ কথাটা বলে প্যাডের আর-একটা কাগজ ছেঁড়ার জন্য হাত বাড়িয়েও টেনে নিল আড়চোখে কলাবতীর দিকে তাকিয়ে।

"নিজে ক্রিকেট খেলেছে যখন, অন্য খেলাগুলোও বুঝে নিতে পারবে, না পারলে আমরা তো আছিই।"

"বয়স তো খুবই কম, ছোটাছুটি করতে পারবে বলেই তো মনে



হয়। এই বয়সে এটা করাও উচিত।"

ভবনাথ কলাবতীর সঙ্গে ওদের পরিচয় করালেন : পরেশ বিশ্বাস, কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য আর সুব্রত ঘোষ। কলাবতীর মনে হল, এরা সবাই তার থেকে দ্বিগুণেরও বেশি বয়সী। কৃষ্ণপদর চুলের তটরেখা কপাল থেকে অনেকটা পিছিয়ে যাওয়ায় যে চড়াটা তৈরি হয়েছে তাকে সামলাবার জন্য ডান কানের পাশ থেকে এক গোছা চুলের প্রবাহ এনে তার ওপর বিছিয়ে দেওয়া। এর সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখছে মোটা গোঁফ। সুব্রত ঘোষের ঝাঁকড়া চুল খুবই এলোমেলো। রোগা শরীর, প্যান্টে গোঁজা টি-শার্ট ঠেলে রয়েছে একটা ছোট্ট ভুঁড়ি, গলায় পাউডারের দাগ। কাচের গোল পেপার ওয়েটটা অনেকক্ষণ ধরে আঙুল দিয়ে টেব্‌লে ঘোরাচ্ছে। ছটফটে প্রকৃতির। দ্রুত কথা বলে।

পরেশ বিশ্বাস নাকঝাড়া ছাড়াও কলম দিয়ে কান খোঁচায়। ধীরে কথা বলে। রেক্সিনের একটা হাতব্যাগ তার সামনে। ব্যাগটা খুলে একটা সবুজ ডাঁশা পেয়ারা বের করে কলাবতীর দিকে বাড়িয়ে বলল, "আমার বাড়ির গাছের।"

ইতস্তত না করে পেয়ারাটা সে তুলে নিল। পরেশকে তখন খুশি দেখাল। "তা হলে ভবদা ওকে প্রথমে মাঠ করতে পাঠান।"

মাঠ করা কী জিনিস ! কলাবতী বিভ্রান্ত বোধ করল।

"রোববারে আমাদের লোক কম থাকে, সোমবারের কাগজে জায়গা বেশি, ভরাতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।" পরেশ কলমটা কানে ঢুকিয়ে একচোখ বন্ধ করে দু'বার ঘোরাল।

"আমিও ঠিক তাইই ভেবেছি।" ভবনাথ টেব্‌লে দু' হাত রেখে ঝুঁকে পড়ল। "অন্যের লেখা অনুবাদ করে কি নিজের লেখা তৈরি করা যায় ?"

"যায় না।" কৃষ্ণপদ বলল।

"লেখা ওরিজিন্যাল হওয়া চাই। সেটাই তো আসল কথা। নিজের স্টাইল, নিজের গদ্য শুরু থেকেই গড়ে তুলতে হবে। নিজে যা দেখবে, শুনবে, বুঝবে, তাই দিয়ে গুছিয়ে অল্পকথায় সহজভাবে লিখবে। কেমন, তাই তো?" ভবনাথ সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার বলল, "ঠিক বলেছি তো?"

তিনটি মাথা অনুমোদন জানিয়ে নড়ে উঠল। কলাবতীর মনে পড়ল বড়দিও ঠিক এই কথাই ক্লাসে বলেছিলেন, তবে প্রসঙ্গটা অন্যরকম ছিল। দেখা, শোনা, বোঝা যেন যথার্থ হয় অর্থাৎ লেখাটা রগরগে করার জন্য, তর্ক বাধানোর জন্য বানিয়ে মিথ্যা কিছু লিখো না।

"কলাবতী, তা হলে সামনের রোববারই তুমি মাঠে যাও। লিগ ক্রিকেট চলছে। ময়দানের বড় মাঠগুলো তুমি তো চেনো। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, কালীঘাট, ইডেন —এগুলোয় পারলে টুঁ মারবে। বাড়ি থেকে সোজা ময়দান চলে যাবে, সন্ধের মধ্যেই অফিসে এসে লিখে দিয়ে তারপর বাড়ি। ডেস্‌কে যে থাকবে সে তোমার লেখা ঝাড়মোছ করে দেবে, ভুলটুল কিছু হলে দেখিয়ে দেবে।"

"রোববার আমি ডেস্‌কে থাকব, কিছু চিন্তা কোরো না।" কেষ্ট ভট্টাচার্য আশ্বস্ত করল কলাবতীকে।

"আমি কোন ম্যাচটা তা হলে করব?" এতক্ষণে কলাবতী কথা বলল।

"সব ম্যাচ।" ভবনাথ দু' হাত ছড়িয়ে দিয়ে বলল, "গড়ের মাঠে যত খেলা আছে, সব।"

কলাবতী আবার বিভ্রান্ত হল। রবিবার ময়দানে দুটো ডিভিশনের কতগুলো লিগ ম্যাচ হয়? পনেরো-কুড়িটা! তা হলে



সব ম্যাচ একজনের পক্ষে দেখা কি সম্ভব!

"আরে তুমি কি সব ম্যাচ দেখবে নাকি?" সুব্রত পেপার ওয়েট ঘোরানো বন্ধ করল। "সব ম্যাচের রেজাল্টটা শুধু নেবে। এ-মাঠ ও-মাঠ ঘোরাঘুরিও করতে হবে না। সি এস জে সি, মানে ক্যালকাটা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব টেন্টটা তো চেনো?"

কলাবতী মাথা কাত করল। একবার তাদের বাংলা দলের প্রেস কনফারেন্স হয়েছিল ওখানে। সে হাজির ছিল। সুব্রত পেপার ওয়েটে মনোনিবেশ করেছে। তার অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব নিল কেষ্ট। "ক্লাবের লোকেরাই স্কোরবুক নিয়ে টেন্টে আসবে। তাই থেকে তুমি যা দরকারি মনে হবে টুকে নেবে।"

বেয়ারা চন্দ্রনাথ একগোছা কপি টেলিপ্রিন্টার থেকে এনে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রেখে যাওয়ার আগে কলাবতীর দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। পরেশ কপিগুলো টেনে নিল। টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে সুব্রত বলল, "বঙ্গবাণী স্পোর্টস।"

তখন ভবনাথ গলা নামিয়ে কলাবতীকে বোঝাতে শুরু করল, "যারা স্কোরবুক নিয়ে আসবে তারাই বলে দেবে সেঞ্চুরি হয়েছে কিনা, কোনও বোলার পাঁচ-ছ'টা উইকেট পেয়েছে কিনা, হ্যাট্‌ট্রিক হয়েছে কিনা। নামী কোনও প্লেয়ার সেঞ্চুরি করলে কত বলে কত মিনিটে, ক'টা বাউন্ডারি আর ওভার বাউন্ডারি, ওটাও লিখে নেবে। কোনওরকম ডিসপিউট দেখা দিলে, কার কী বক্তব্য জেনে নেবে।"

কিছু কপি কৃষ্ণপদর সামনে ঠেলে দিয়ে পরেশ বলল, "দ্যাখ তো কেষ্ট, ক্রিকেট বোর্ডের মিটিং ছিল, কোনও খবরটবর আছে কিনা।"

সুব্রত মুখ নামিয়ে টেলিফোনে কথা বলে যাচ্ছে নিচুস্বরে।

ভবনাথ বোকা ছাত্রীকে জ্যামিতির কঠিন একটা প্রব্লেম বোঝাবার মতো মুখ করে বলল, "আউট-ফাউট নিয়ে খুব ঝামেলা হয়। সাপোর্টাররা তো বটেই, ব্যাটস্ম্যানরাও রেফারিকে মারে।"

"ভবদা, রেফারি নয়, আম্পায়ার।" সুব্রত টেলিফোনটা মুখ থেকে সরিয়ে কথাটা বলেই আবার ফোনটা মুখে ধরল।

ভবনাথ প্রথমে হতবাক হল, তারপরই রেগে বলে উঠল, "জানি, জানি, রেফারি নয়, আম্পায়ারই। পঁয়ত্রিশ বছর মাঠ চষছি, আমাকে আর শিখিয়ো না। ...রেফারি আর আম্পায়ারের মধ্যে পার্থক্য কিছু কি আছে? সাহেবদের এই এক বাজে অভ্যেস, একই কাজের দুটো নাম দেওয়া। ফুটবলের রেফারি আর হকির আম্পায়ার, কাজ তো একই! তা হলে দুটো নাম দেওয়া কেন?"

প্রশ্নটা যেহেতু কলাবতীর দিকে তাকিয়ে হল তাই সে সযত্নে মাথা নেড়ে বলল, "কোনও মানে হয় না।"

ভবনাথের রাগ প্রশমিত হল। সে আবার শুরু করল, "ফুটবল মাঠের মতো মারপিট, হাঙ্গামা ক্রিকেট মাঠেও এখন হচ্ছে। লিগে রেলিগেশনের ম্যাচগুলোতেই বেশি করে হয়। এইরকম ম্যাচে তুমি কিন্তু একদম যাবে না। যদি দ্যাখো লাঠি, বাঁশ নিয়ে কিছু লোক একজনের পেছনে দৌড়চ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে তুমি উলটোদিকে দৌড়বে। কী ঘটল-টটল, সেটা পরে টেন্টে জেনে নেবে। শাড়ি পরে ছুটে পালানো যায় না...।"

"না, না, আমি মাঝে-মাঝে শাড়ি পরি, নয়তো সালোয়ার-কামিজ আর জিন্সই বেশিরভাগ সময় পরি।" কলাবতীর কথায় ভবনাথ আশ্বস্ত হল।

"মাথাটাথা ফাটল কিনা, অ্যারেস্ট হয়েছে কিনা এসব তুমি টেন্টে অন্য কাগজের রিপোর্টারদের কাছ থেকেই পেয়ে যাবে। অফিসে এসে ডেস্কে যে থাকবে তাকে বললেই সে পুলিশে,



হাসপাতালে ফোন করে জেনে নেবে। আচ্ছা, আজ তা হলে এই পর্যন্তই, তোমাকে তো... বাড়ি যেন কোথায়?"

"কাঁকুড়গাছি।"

"ভবদা, বলা ফোন করে জানাল সি এ বি-তে যেতে পারেনি। ছেলের পা ভেঙেছে, তাকে নিয়ে মেডিকেলে গেছে।" সুব্রত বলল ফোন রেখে দিয়ে।

"মুশকিলে ফেললে তো।" ভবনাথ বিব্রত ও বিরক্ত মুখে সুব্রতকে নির্দেশ দিল, "সি এ বি-তে ফোন করে বিল্টুবাবুর কাছ থেকে জেনে নাও।"

কলাবতী তখন হাঁটতে শুরু করেছে যাওয়ার জন্য। পেছন থেকে পরেশ বলল, "পেয়ারা কেমন লাগল সেটা বোলো কিন্তু।"

রাস্তায় বেরিয়ে এসে দেখল গাড়িতে ঠেস দিয়ে কাকা রোল খাচ্ছে। সত্যশেখর তাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে বললেন, "তোর জন্য দুটো রেখেছি, চিকেনের। এত দেরি হল কেন? কী বলল সদানন্দ ঘোষ?"

"যেতে-যেতে বলছি।"

গাড়িতে ওঠার সময় সে দেখল সিটের ওপর দুটো রোল। হাতে তুলে নিয়ে একটা পাকানো কাগজ ছিঁড়ে কামড় বসাল।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সত্যশেখর বললেন, "খেতে বেশ, ঝালটা বেড়ে দিয়েছে, গোটাছয়েক সেঁটেছি। ওদিকে একটা ফুচকাওলাকে দেখলুম—"

"কাকা, আজকের মতো রিটায়ার করো। তার বদলে এই পেয়ারাটা খাও।"

সত্যশেখর পেয়ারায় কামড় দিয়ে দু-তিনবার চিবিয়েই থুঃ থুঃ করে মুখ থেকে ফেলে দিয়ে বললেন, "মানুষে খায় এ-জিনিস!"

বাড়ি ফেরামাত্র মুরারির কাছ থেকে শুনল দাদু তার জন্য পড়ার

ঘরে অপেক্ষা করছেন।

"কাজ হল?"

গদিমোড়া ইজিচেয়ারে রাজশেখর বই পড়ছিলেন। পাশের টেব্‌লেও একটা বই রাখা।

"হল। তোমার চিঠিটা দারুণ কাজে লেগেছে।"

"চিঠি লিখতে জানা চাই। এটা তো আর বেড়াল-কুকুরের ওপর চিঠি নয়।" রাজশেখর নাতনির পেছনে দাঁড়ানো লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন।

"ও-চিঠিটা আমার লেখা ছিল না, মলয়ার লেখা।" সত্যশেখর বিপন্ন প্রতিবাদ জানালেন।

"চিঠি লেখা একটা আর্ট। রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠিগুলো একবার পড়ে দেখো, মেয়েকে লেখা জওহরলালের চিঠিগুলোও তো পড়োনি। কিছুই পড়লে না, শুধু অন্যকে দিয়ে চিঠিই লেখালে।... কালু, বলো আমার চিঠিতে কী ফল হল?"

"সদানন্দবাবু তো খুব উচ্ছ্বসিত। আমার ঠাকুর্দা তাঁর বাবার কাছে বাংলা শিখেছেন—"

"ঘেঁচু শিখেছেন।" রাজশেখরের কণ্ঠ থেকে বজ্রপাতের চাপা শব্দ বেরিয়ে এল। "ক্লাসে এসে শুধু বেতটা দেখিয়ে বলতেন, 'পদ্য মুখস্থ হয়েছে? বই বন্ধ করে এবার খাতায় লেখ,' তারপর নাক ডাকিয়ে ঘুমোতেন। অ্যাকের নম্বরের ফাঁকিবাজ ছিলেন সদার বাবা।"

"কিন্তু দাদু, তুমি যে চিঠিতে লিখেছ—।"

"আরে ওটাই তো আর্ট। লিখেছি তো কী হয়েছে? কাজ হাসিল করতে হলে ঠিক জায়গায় ঠিক কথাটি বলতে হয়।"

একগাল হেসে কলাবতী বলল, "আমিও আজ বলেছি। তোমার নাম করে বলে দিলাম, আমার কাজের জন্য বঙ্গবাণীকে



মাইনে দিতে হবে না। ব্যস, ভদ্রলোক এটা শুনে ভীষণ স্বস্তি পেয়ে অমনই স্পোর্টস এডিটরকে তলব করলেন।"

এর পর কলাবতী বঙ্গবাণীতে যা দেখল, শুনল, সবিস্তারে রাজশেখরকে তা জানাল। "একটা জিনিস বুঝলাম, ওখানকার লোকগুলোর মনটা ভাল, কিন্তু খেলা সম্পর্কে আগ্রহটা যেন কম।" একটু থেমে গভীর স্বরে সে বলল, "তাতে অবশ্য আমার কিছু আসে-যায় না। আমার দরকার একটা লেখার জায়গা।"

"কিন্তু এই ম্যাচ-রেজাল্ট টোকা রিপোর্টারি করে কি কোনও লাভ আছে?" সত্যশেখর এবার খুবই গুরুতর একটা সমস্যা হাজির করে বাবার দিকে তাকালেন।

"তা কেন?" কলাবতী প্রতিবাদ করল। "আমাকে টেন্টে গিয়ে রেজাল্ট টুকতে বললেই কি তা করব? মাঠে বসে ম্যাচ দেখব। কেউ ভাল খেললে তার সম্পর্কে লিখব যাতে সি এ বি-র নজরে পড়ে। কাগজে প্রশংসা বেরোলে উঠতি প্লেয়াররা খুব উৎসাহ পায়।"

"তুই উৎসাহ পেতিস?" সত্যশেখর জানতে চাইলেন।

"উৎসাহ! কাগজে তো কখনও আমার নামই বেরোয়নি। উৎসাহ পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।"

এইবার রাজশেখর তাঁর হাতের বইটা তুলে বললেন, "কার্ডাস, নেভিল কার্ডাস।... 'সামার গেম', সেই টোয়েন্টি নাইনের বই।" বইটা রেখে পাশ থেকে আর-একটা তুলে নিলেন। "এটা 'গুড ডেজ', থার্টি ফোরের বই। বাবা কিনে দিয়েছিলেন, কত বছর পর শেল্‌ফ থেকে বের করলুম। কার্ডাসের সেরা আমলের লেখা। কালু এবার তোকে তো এসব বই পড়তে হবে। চার পুরুষ ধরে কার্ডাস পড়ার একটা রেকর্ড তা হলে হবে।"

কলাবতী চোখ প্রায় ছানাবড়া করে বলল, "ওরে বাবা, ওই

কঠিন ইংরিজি পড়ার বিদ্যে আমার এখনও হয়নি দাদু। রেকর্ডটা পরে করলেও চলবে।"

"আমি তোকে বাংলা মানে করে বুঝিয়ে দেব।" বলা বাহুল্য, কথাটা সত্যশেখরের।

"থাক কাকা। ময়দানি ক্রিকেটের হালচালটা আগে বুঝে আসি তারপর তোমার বাংলা-কার্ডস শুনব।"

রবিবার দশটায় কলাবতী ময়দানে পৌঁছল। উঠতি প্রতিভা থাকে ছোট ক্লাবে, এই বিশ্বাসে সে ঠিক করেই রেখেছে ছোট ক্লাবের ম্যাচ দেখবে। শহিদ মিনারের ধারে ভবানীপুর মাঠে আম্পায়াররা স্টাম্পের ওপর বেল সাজাচ্ছেন। বাউন্ডারির ধারে খেলোয়াড়রা জড়ো হয়েছে মাঠে নামার জন্য। কলাবতী এই মাঠের খেলা দেখার জন্য দাঁড়াল না। তার কাঁধে ঝুলছে চামড়ার ঝুলি। তাতে আছে জলের বোতল, স্যান্ডুইচ, কলা, কাপড়ের টুপি আর খাতা-কলম। ভবনাথের উপদেশমতো সে জিন্স আর শার্ট পরেছে।

সি এস জে সি টেস্ট ও মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির মাঝের পথ ধরে এগিয়ে গুরু নানক সরণি আর রেড রোড পার হয়ে, যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের স্মরণে গড়া স্মৃতিস্তম্ভের চাতালে এসে সে দাঁড়াল। তার সামনে রয়েছে ফুটবলে শট নিতে যাওয়া গোষ্ঠ পালের মূর্তি। আরও দূরে মোহনবাগানের ঘেরা মাঠ। ডান



দিকে ইডেন গার্ডেন্স স্টেডিয়াম, বাঁ দিকে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ঘেরা মাঠ। এইসবের মধ্যে খোলা মাঠে সাদা ট্রাউজার্স শার্ট পরা লোকেদের ছোটাছুটি, ব্যাট-বলে ধাক্কার শব্দ আর অ্যাপিলের চিৎকার।

কোন মাঠে সে প্রথমে যাবে? তালতলা? পুলিশ, কাস্টমস, গ্রিয়ার না হাইকোর্ট মাঠে? ঘেরা মাঠে সে যাবে না এটা আগেই ঠিক করে রেখেছে। মনে-মনে কিছু একটা স্থির করে সে পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে টস করল। সেটা লুফেই 'টেইল' বলে মুঠো খুলে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "হাইকোর্ট!" মাঠে প্রথম দিন রিপোর্টারি করতে এসেই ঠিক টস ডেকেছে। এটা তার কাছে শুভ লক্ষণ বলে মনে হল।

টেন্টের বাইরে, বাউন্ডারির ধারে ছোট একটা শামিয়ানা। তার নীচে দুই দলের স্কোররা টেবলে স্কোর লেখার খাতা বিছিয়ে পাশাপাশি বসে। সঙ্গে পেনসিল, ইরেজার, নানা রঙের কলমে ভরা বাক্স। স্টিলের কয়েকটা চেয়ার আর একটা বেঞ্চ পাতা। দু'দলের কিছু খেলোয়াড়, ক্লাবকর্তা তাতে বসে। দর্শক বলতে কেউই নেই। চমৎকার বাতাস বয়ে আসছে গঙ্গার দিক থেকে। বাউন্ডারি ফ্ল্যাগগুলো টানটান হয়ে উড়ছে। দু'ধারে সাদা বিছানার চাদরের মতো বাঁশে বাঁধা সাইট স্ক্রিন বাতাসে কাঁপছে। কলকাতার মাঝখানে অলস নির্জন দুপুর কাটাবার সেরা জায়গা ক্রিকেট মরসুমের গড়ের মাঠ।

দূর থেকেই কলাবতী শামিয়ানার বাঁশে ঝোলানো স্কুলের ব্ল্যাক বোর্ডের মতো টেলিগ্রাফিক স্কোরবোর্ডটার দিকে তাকাল। তাতে টিনের প্লেটে সংখ্যা ঝুলিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় ম্যাচের হালচাল। বোর্ডের ওপর দিকে পাশাপাশি ঝুলছে শূন্য ও ২, এখন ব্যাটস্‌ম্যান দু'জনের এই রান। মাঝে ৪ অর্থাৎ চারজন আউট হয়ে গেছে,

তার নীচে ৭, তার মানে ইনিংসের এখন এটাই মোট রান।

চার উইকেট পড়ে গেছে! হতেই পারে না, কলাবতীর মনে হল নিশ্চয় ভুল করে '৪' ঝুলিয়ে দিয়েছে। খেলা তো বড়জোর তিন কি চার ওভার মাত্র হয়েছে, আর এর মধ্যেই সাত রানে চার উইকেট!

দ্রুত পা চালিয়ে সে শামিয়ানার নীচে এল। দু'জন স্কোরারের মাঝে ঝুঁকে বিনীতভাবে সে বলল, "দাদা চারটে উইকেট কে নিল?"

ওভার সদ্য শেষ হয়েছে। স্কোরবুকের নানা জায়গায় ওরা পেনসিলের আঁচড় দিচ্ছে। কেউ জবাব দিল না।

আবার সে বলল, "উইকেট চারটে কে...।"

"আপনি কে?" বয়স্ক স্কোরারটি মুখ না তুলে প্রশ্ন করল।

"প্রেস রিপোর্টার।" কলাবতী গলাটা গম্ভীর করে বিরিক্কি হওয়ার চেষ্টা করল। লোকটি তেরছা চোখে কলাবতীকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বিস্মিত হল। ছেলেদের পোশাকে একটি মেয়ে, তাও এত অল্পবয়সী, সুতরাং অবাক তো হবেই!

"কোন কাগজের?"

"বঙ্গবাণী।" বলেই সে অস্বস্তিতে পড়ল। যদি জিজ্ঞেস করে, "প্রেসকার্ড দেখি?" তা হলে তো একটা বেইজ্জতি পরিস্থিতিতে সে পড়ে যাবে। তার কাছে তো প্রেস রিপোর্টারের কোনও প্রমাণপত্রই নেই। কিন্তু লোকটি আর কোনও কথা বলল না, যেহেতু পরের ওভার আরম্ভ হয়ে গেছে।

খাতা বের করে কলাবতী যতটা সম্ভব ততটা ঝুঁকে স্কোরবুক থেকে বোলারের নামটা পড়ার চেষ্টা করল। স্বাধীন সঙ্ঘের বি. বাগচি নামের বোলারই চারটি উইকেট পেয়েছে। খেলা হচ্ছে মিত্র পরিষদের সঙ্গে। তিনজন শূন্য রানে বোল্ড; একজন এক রানে



এল বি ডবলু; অতিরিক্ত চার বাই রান আর নট আউট ব্যাটস্ম্যান দুই। বি. বাগচির দু' ওভারে চার উইকেট, এক রান দিয়ে!

খেলার পঞ্চম ওভার শুরু হয়েছে। বাগচির এটা তৃতীয় ওভার। প্রথম বলেই উইকেটকিপারকে ক্যাচ এবং ফসকান এবং বলটা গেল বাউন্ডারিতে। স্কোয়ার লেগ থেকে কলাবতী বুঝতে পারল না বলটা কী ধরনের ছিল। গুড লেংথে জোরে বল, খুবই জোরে। ব্যাটস্ম্যান যেন ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে কুঁকড়ে গেল। বলটা ব্যাটের কানায় লেগেছিল। মনে হচ্ছে সুইং ছিল। পরের তিনটি বলই প্যাডে লাগল। বাগচি ছাড়া আর কেউ কিন্তু এল বি ডবলু অ্যাপিল করল না। কলাবতী একটু অবাকই হল। আম্পায়ার সবক'টা অ্যাপিলেই মাথা নাড়ল:

"এটা রমেনের কাণ্ড, আমাকে ডোবাবার জন্যই বাগচিকে আজ নামিয়েছে।"

কলাবতীর পেছনেই চাপা হিসহিস স্বরে কেউ একজন কথাগুলো বলল। মুখ ফিরিয়ে সে দেখল, বেঁটে গোলগাল, ধুতি, পাঞ্জাবি, জওহরকোট, চশমা, টাকমাথা এবং মুখটা রাগে থমথমে এক প্রৌঢ়। লোকটা কথাগুলো যাকে বলল, সে প্যান্ট, শার্ট খয়েরি হাফহাতা সোয়েটার পরা এক যুবক, মুখটা কাঁচুমাচু।

"এখুনি রমেনকে খবর পাঠা, বাগচিকে আর-একবারও যেন বল না দেয়। বোলিং যদি দেখাতে চায়, তা হলে অন্য ম্যাচে যেন দেখায়।... আড়াইশো রান পরিষদকে দেব কথা দিয়েছি আর রমেন কিনা চারটে উইকেট ফেলে দিল সাত রানে? ক্যাপ্টেনসি করা ঘুচিয়ে দেব। বলে দে, মিত্র পরিষদের টোটাল আড়াইশো করাতেই হবে। নয়তো পরের ম্যাচ থেকে স্বাধীন সঙ্ঘের অন্য ক্যাপ্টেন!"

"এখুনি খবর পাঠাচ্ছি তিলুদা।" খয়েরি হাফ সোয়েটার ব্যস্ত

www.boiRboi.blogspot.com

হয়ে পা বাড়াল। তখন একটা আক্ষেপের শব্দ উঠল শামিয়ানার নীচে। কলাবতী তাড়াতাড়ি মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখল সেকেণ্ড স্লিপ মাঠে উপুড় হয়ে, বল যাচ্ছে থার্ডম্যানের দিকে। ক্যাচ ফসকেছে!

এবার ওভারের শেষ বল। বাগচি ষোলো কদম ছুটে আসবে। শেষ কদমে লাফিয়ে উঠে হুবহু কপিলদেবের মতো ডেলিভারিটা করবে। কলাবতী লক্ষ করল, স্ট্রাইকার ডেলিভারির আগেই স্টাম্পের কাছে চলে এল এবং বোধ হয় চোখ বুজিয়ে ফেলেই ব্যাটটা সামনে ধরে রইল।

বোল্ড! হওয়ারই কথা। ব্যাটস্ম্যানটিকে মনে হচ্ছে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আম্পায়ারের দিকে না তাকিয়েই সে হাঁটতে শুরু করেছে। একজন ফিল্ডার দৌড়ে গিয়ে তাকে আটকাল। নো বল ডেকেছেন আম্পায়ার। ক্রিজে আবার ফিরে যাওয়ার সময় তার চলন দেখে কলাবতীর মনে হল, যেন খুবই অপমানিত বোধ করছে তাকে ডেকে নেওয়ায়। বাগচিকে আর-একটা বল করতে হবে। এবার সে ছুটে এসে খুব ধীরগতির ডেলিভারি করল। স্ট্রাইকারটি ব্যাট চালাল এমনভাবে যাতে বোঝা গেল সে ঠিক করেই রেখেছিল, হয় এস্পার নয়তো ওস্পার! ক্যাচটা উঠল বোলারেরই মাথার ওপর এবং বাগচি সেটা লুফে নিল।

"হাফ সাইড তেরো রানে! অথচ আড়াইশো দেব বলেছি শিবুদাকে।" দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা শব্দও হল।

কলাবতী আর মুখ ফিরিয়ে দেখল না। সে জানে কথাটা কে বলল। ওদিকে এক গ্লাস জল হাতে খয়েরি হাফ সোয়েটার মাঠের মধ্যে পড়িমরি ছুটে যাচ্ছে ক্যাপ্টেন রমেনের দিকে।

এর পরই ম্যাচের চরিত্রটা বদলে গেল। পরের ওভারে মিত্র পরিষদ পেল এগারো রান। বাগচি ডিপ ফাইন লেগ থেকে হেঁটে



আসছে তার চতুর্থ ওভার বল করার জন্য। ওর বলে কী আছে সেটা বোঝার জন্য কলাবতী সাইটস্ক্রিনের দিকে এগোল। ওখান থেকে লক্ষ করলে ধরা যাবে বলে কী কারিকুরি রয়েছে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! ক্যাপ্টেন হাত নেড়ে বাগচিকে ডিপ ফাইন লেগে ফিরে যেতে বলছে! বাগচি হতভম্বের মতো তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং মাঠের বাইরে কলাবতীও। তিন ওভার বল করে পাঁচ উইকেট পাওয়া বোলারকে আর বল করতে দেওয়া হল না।

এর পর ক্রিকেট খেলার নামে শুরু হল প্রহসন। রানের বন্যা বইতে শুরু করল মাঠের ওপর। এল বি ডবলু-র জন্য একটা আবেদনও আর শোনা গেল না, একটা ক্যাচও আর লোফা হল না, কাছে দাঁড়ানো ফিল্ডারের কাছে বল গেলেও নির্বিঘ্নে রান নেওয়া গেল, ব্যাটস্ম্যান ক্রিজের দু' হাত বাইরে এবং উইকেটকিপারের গ্লাভ্‌সে বল, কিন্তু স্টাম্পড্ না হয়ে সে ক্রিজে ফিরে এল। একমাত্র বোল্ড আউট হওয়া ছাড়া ব্যাটস্ম্যানদের আর কোনওভাবে আউট হওয়ার উপায় রইল না। কিন্তু লেগস্টাম্পের বাইরে ছাড়া বলই পড়ছে না, সুতরাং বোল্ড হওয়ারও উপায় নেই।

এত সুযোগ পেয়েও মিত্র পরিষদের আরও তিনজন আউট হল। রানের জন্য দৌড়ে-দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে একজন ব্যাটস্ম্যান হুমড়ি খেয়ে পড়ে চটপট আর ওঠারই চেষ্টা করল না। তাকে রানআউট না করে উপায় নেই, তাই করা হল। আর-একজন ড্রাইভ ধরনের কিছু একটা করার পর বলটা ব্যাট থেকে স্টাম্পে এসে লাগল। তৃতীয়জন খুব জোরে সামনে দাঁড়ানো সিলি মিড অফ-এর দিকে বল মারে। সে বেচারি নিজের পেট বাঁচাবার জন্য খপ করে বলটা ধরে নেয়। পেট রক্ষা করার আনন্দে সে ক্যাচটা

ফেলে দেওয়ার কথা ভুলে যায়।

খেলা দেখতে-দেখতে কলাবতীর আটঘরা-বকদিঘি ক্রিকেট ম্যাচের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। গ্রামের ক্রিকেট আর কলকাতার ক্রিকেট তার কাছে যেন সমান মনে হল। তার থেকেও যেটা বেশি করে অনুভব করল; এইরকম গড়াপেটা করে খেলে যারই লাভ হোক, ক্ষতিটা হচ্ছে বাংলার। ময়দানে যে এইভাবে ক্রিকেট খেলা হয় এটা সে জানত না।

মিত্র পরিষদের ইনিংস লাঞ্চে হল আট উইকেটে ২৫২ রান। দু' দলের খেলোয়াড়রা টেন্টে বসে যখন খাওয়ায় ব্যস্ত, তখন প্রায় নির্জন শামিয়ানার নীচে কলাবতী স্যান্ডুইচের মোড়ক খুলল। খেতে-খেতে সে ঠিক করল, স্বাধীন সঙ্ঘের ক্যাপ্টেন রমেনের সঙ্গে কথা বলে জেনে নেবে কেন সে বাগচিকে দিয়ে আর বল করাল না।

মিত্র পরিষদ ফিল্ড করতে নামার পর কলাবতী দেখল, রমেন টেন্টে ঢোকার কাঠের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। সম্ভবত ব্যাটিং অর্ডারে নীচের দিকে, তাই এখনও প্যাড পরেনি।

"আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।"

একটি মেয়ে, দুপুরে ময়দানে ক্রিকেট মাঠে, তাও আবার কথা বলতে চায়, সুতরাং রমেন খুব অবাক হয়ে বলল, "বলুন।"

"আমি বঙ্গবাণীর রিপোর্টার।"

রমেন আরও অবাক! ভরদুপুরে রিপোর্টারি করতে কোনও মেয়েকে সে কখনও দেখেনি।

"আপনি বাগচিকে দিয়ে আর বল করালেন না, এটা আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছে। তিন ওভারে পাঁচটা উইকেট যে নেয় তাকে আর বল না দেওয়ার কারণটা বলবেন?"

রমেন ভাবেনি এমন প্রশ্নের সম্মুখীন তাকে হতে হবে। ছোট



টিমের খেলা দেখতে কখনও কোনও রিপোর্টার আসে না, এইসব খেলায় দর্শকও হয় না। সুতরাং যেমন খুশি তেমনভাবে খেললেও কৈফিয়ত চাইবার কেউ নেই। রমেন কী জবাব দেবে বুঝতে পারছে না। উত্তর হাতড়াতে লাগল।

"ছেলেটার বলের পেস লক্ষ করেছেন?" রমেন প্রশ্ন করল।

"দারুণ।" কলাবতী বলল।

"উইকেটের অবস্থা খুব খারাপ। ময়দানে কোনও খোলা মাঠেই যত্ন নিয়ে উইকেট তৈরি করা হয় না। বাগচির এক-একটা বল এমন লাফিয়ে উঠছিল যে, আমার ভয় করেছিল। মনে হল, ব্যাটস্ম্যানদের মারাত্মক চোট লাগতে পারে, মারাও যেতে পারে। তাই আর ওকে বল দিইনি।" চমৎকার একটা যুক্তি দাখিলের সুখ রমেনের মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

"কিন্তু আমি যতটুকু দেখলাম, তাতে একটা বলও লাফাতে দেখিনি।"

"না, না, কী বলছেন আপনি! ওর থার্ড ওভারে তিনটি বল ব্যাটস্ম্যানের কপালের কাছে উঠেছিল।"

কলাবতী বুঝল তর্ক করে লাভ নেই, তাই সে এবার চালাকির আশ্রয় নিল। গলাটা একটু নামিয়ে বলল, "তিলুদা কিন্তু আমাকে বলেছেন মিত্র পরিষদকে আজ আড়াইশো রান দেবেন। আমাকে আণ্ডার প্রিপেয়ার্ড উইকেট বা ইনজুরি হতে পারে বলে কোনও লাভ নেই।"

রমেনের অপ্রতিভ অবস্থাটা কেটে যাওয়ার পর মুখটা থমথমে হয়ে উঠল।

"আপনি যদি ওদের আড়াইশো রান না দেওয়াতে পারতেন, তা হলে কিন্তু পরের ম্যাচেই উনি ক্যাপ্টেন্সি থেকে আপনাকে বরখাস্ত করতেন।"

"তাই বলেছে বুঝি?" রমেন দাঁতে দাঁত ঘষল। "অফ দ্য রেকর্ড বলছি, পরিষদ হল শিবু ঘোষের টিম। শিবু ঘোষ, নিশ্চয় জানেন বাংলার ক্রিকেটের একটা কেষ্টবিষ্টু, অনেক ক্ষমতা রাখে। শুনছি নাইনটি সিক্সে ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেটের খেলা এখানে আনার চেষ্টা হবে। তখন অনেক কমিটি, সাব-কমিটি হবে। শিবু ঘোষ ইচ্ছে করলেই তিলুদাকে একটা কমিটিতে ঢুকিয়ে দিতে পারে। এইবার কি বুঝতে পেরেছেন কেন পরিষদকে তোয়াজ করে জিতিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে? আপনাকে বলেই দিচ্ছি, আমরা দেড়শো রানের মধ্যেই আউট হব, খেলাটা দেখুন আর আমার কথাটা মিলিয়ে নিন।"

"আপনি এইভাবে গড়াপেটা খেলা খেলতে রাজি হলেন?" কলাবতীর স্বরে আন্তরিক বেদনার ছায়া পড়ল। "একটা অল্পবয়সী সম্ভাবনাময় বোলার, ভাল বল করে সবার চোখে পড়তে চায়, আর তাকে...।"

"আপনি এ-লাইনে নতুন, তাই এইসব কথা বলছেন। ময়দানটা আগে ভাল করে ঘুরে দেখুন। হরির লুটের মতো গড়াপেটা ম্যাচ হওয়ায় গত বছর লিগই বাতিল করা হল। এ-বছর একদিনের লিগ হয়েছে। কিন্তু তাতে কি গড়াপেটার উচ্ছেদ ঘটেছে? করাপ্ট, অল করাপ্ট।" রমেন কথাগুলো বলে সিগারেটটা মাটিতে আছড়ে ফেলে হনহন করে টেন্টের মধ্যে ঢুকে গেল।

ম্যাচটা শেষপর্যন্ত দেখার ইচ্ছে কলাবতীর আর রইল না। সে হাঁটতে শুরু করল। দু-তিনটে মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ খেলা দেখে আবার হাঁটতে লাগল। কোনও মাঠেই তার চোখ বা মন বসল না। বুদ্ধি নেই, সাহস নেই, পরিচ্ছন্নতা নেই, অমন খেলা সময় নষ্ট করে দেখা যায় না।



অবশেষে ক্লান্ত বোধ করে সে ওয়াই এম সি এ মাঠে এল। কিছু দর্শক স্কোরারদের কাছাকাছি ঘাসে পা ছড়িয়ে বসে ঝালমুড়ি চিবোচ্ছে। কলাবতীও এক টাকার ঝালমুড়ি কিনল। স্কোরবোর্ডে দেখল তিন উইকেটে ১০৮। একজনের ২৩ ও অন্যজনের ১৬ রান। আউট হওয়াদের কেউ হয়তো হাফ সেঞ্চুরি করে থাকতে পারে কিন্তু কাগজে তার নাম উঠবে না। সেজন্য নব্বই-টব্বই অন্তত করতে হবে। কলাবতী দর্শকদের পাশে গিয়ে বসল। একজনের কাছ থেকে জেনে নিল, খেলা হচ্ছে সবুজপাতার সঙ্গে কদমতলা ফ্রেন্ডসের। ব্যাট করছে পাতা।

হঠাৎ তার মনে হল কিছু যেন একটা হচ্ছে। আম্পায়াররা কেমন যেন অন্যমনস্ক, সাত বলে ওভার হল, এমনকী আট বলেও। মিড উইকেটের ফিল্ডার বলের পেছনে ছুটতে-ছুটতে বলে শট মেরে বাউন্ডারি পার করিয়ে দিল। বল এন্ডার শর্ট পিচ পড়ছে। যেন স্বাধীন সঙ্ঘেরই ফিল্ডিংটা কলাবতীর মনে হল আবার সে দেখছে। তবে এখানে এগুলো ঘটছে শুধু একজন ব্যাটস্‌ম্যানের ক্ষেত্রেই, যে গাওস্করের মতো সাদা সান হ্যাট পরে খেলছে। গাওস্করের মতোই বেঁটে, গাঁট্টাগোট্টা, ব্যাট ধরা, হাঁটাচলাও তার মতো।

"ওরে ইন্দ্রজিৎ, বাবা, আঁকুপাকু করিসনি।" দর্শকদের একজন ব্যঙ্গভরে চেঁচিয়ে উঠল। "তোর সেঞ্চুরি হবেই হবে, একটু রয়েসয়ে দেখে খেল।"

কলাবতী মুখ ফিরিয়ে দেখল ২৩ সংখ্যাটা ৪৪ হয়ে গেছে তিন ওভারেই। হাফপ্যান্ট পরা একটি ছেলে বোর্ডে স্কোর ঝোলাবার কাজ করছে। স্কোরারদের পেছনে গিয়ে কলাবতী দাঁড়াল। আই, তালুকদারের নামের ঘরে দেখল দশটা বাউন্ডারি আর চারটে এক লেখা।

"বাউন্ডারি, আই. তালুকদার।" এক স্কোরার বলে দিল, অন্যজন তার স্কোরবইয়ে চার বসাল।

"বিলু, স্কোর বায়ান্ন কর।" স্কোরার চেঁচিয়ে হাফপ্যান্ট পরা ছেলেটিকে নির্দেশ দিল।

"বায়ান্ন কেন? চার মারল, আটচল্লিশ হবে তো!" বিলু প্রতিবাদ জানাল যোগের ভুল ধরিয়ে।

"যা বলছি কর।" স্কোরার চাপা ধমক দিল। বেচারা বিলু রানের তোড়ে এমন হিমশিম খাচ্ছে যে, তাল রেখে স্কোর টাঙাতে ভুল করে ৫২-র বদলে ৬২ করে ফেলল।

হইহই করে উঠল দর্শকদের দু-তিনজন।

"ওরে চক্ষুলজ্জার মাথাও কি খেয়ে ফেলেছিস! চুয়াল্লিশ থেকে বাষট্টি, একটা স্ট্রোকেই!... চালিয়ে যা বাবা।"

আর-একজন চেঁচিয়ে উঠল, "বোলার চেঞ্জ, বোলার চেঞ্জ! এই বোলারটা গুড লেংথে বল ফেলছে, একে চেঞ্জ করো।"

সবাই হেসে উঠল এ-কথা শুনে। লজ্জিত বিলু তাড়াতাড়ি ৫২ করে দিল ৬২-কে।

"দাদা, ব্যাপারটা কী বলুন তো?" কলাবতী উঠে গিয়ে সেই লোকটির পাশে বসল যে 'ওরে ইন্দ্রজিৎ, বাবা' বলে চেঁচিয়েছিল। একটি মেয়ে ময়দানে বসে ছোট দুটো ক্লাবের লিগ ম্যাচ দেখছে, লোকটির এতে অবাক হওয়ারই কথা। সে অবাক হয়ে কলাবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ময়দানে নতুন?"

"হ্যাঁ। ঠিক বুঝতে পারছি না। ওখানে কী হচ্ছে।"

"ক্রিকেট বোঝেন?"

"আমি খেলি। গত বছর বেঙ্গলের হয়ে এলাহাবাদে খেলে এসেছি।"

লোকটি এবার গম্ভীর হয়ে গেল। "ওই যে ইন্দ্রজিৎ



তালুকদার, এই সিজনে ওর চারটে সেঞ্চুরি হয়ে গেছে। ওকে বেঙ্গল টিমে ঢোকাবার দাবিটা জোরালো করতে আরও অন্তত একটা সেঞ্চুরি দরকার। সেই সেঞ্চুরিটাই ওখানে হচ্ছে।"

"হলে, বেঙ্গল টিমে ইন্দ্রজিৎ ঢুকে যাবে?"

"যাবে, ওর লবিটা ভাল। অন্তত চোদ্দজনের মধ্যে তো আসবেই।"

"কদমতলা ফ্রেন্ডস এতে রাজি হল?"

"কদমতলা ফ্রেন্ডস তো আর চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য লড়ছে না। লিগের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে, ওখানেই থেকে যাবে। সুতরাং এই ম্যাচটা হারলে ওদের কোনও ক্ষতি হবে না। অথচ সবুজপাতা ঋণী হয়ে রইল কদমতলার কাছে। পরে যখন কদমতলার দরকার হবে সবুজপাতা ঋণশোধ করে দেবে।"

কলাবতীর স্তম্ভিত মুখটা দেখে লোকটি মুচকি হেসে বলল, "খেলা দেখুন। বাঙালি ছেলের বীরত্ব কতদূর যায় সেটা স্বচক্ষে দেখুন।"

কলাবতীর দেখা আর শোনা হতে-হতেই ইন্দ্রজিতের ৫২টা ৭২ হয়ে গেল। তার মনে হচ্ছে সে যেন অ্যালিসের মতো কোনও আজব দুনিয়ায় বসে খেলা দেখছে। যথাসময়ে সেঞ্চুরিটা হয়ে গেল। কদমতলার জনাদুই খেলোয়াড় হ্যান্ডশেক করল, সাদা টুপি এবং ব্যাট তুলে ইন্দ্রজিৎ শামিয়ানা থেকে কয়েকজনের পাঠানো করতালি গ্রহণ করল।

সবুজপাতা শেষপর্যন্ত তিন উইকেটে ম্যাচটা জিতল। কলাবতী স্কোরবই থেকে খেলার ফল টুকে নেওয়ার সময় দেখল, ইন্দ্রজিতের অপরাজিত ১২৪ রানে আছে তেইশটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি। শতরানে পৌঁছেছে ৪৪ বল খেলে।

ভবনাথদা বলেছিলেন 'কার কী বক্তব্য জেনে নেবে।' কোট

খুলে চেয়ারে বসে একজন আম্পায়ার চা খাচ্ছেন। কলাবতী তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "স্কোরবুকে যে জোচ্চুরি করে রান বাড়ানো হল, তাতে আপনারা আপত্তি করলেন না?"

"বাড়ানো হয়েছে নাকি!" তিনি আকাশ থেকে পড়লেন। "আমরা তো মাঠে ছিলাম, স্কোরে কী লেখা হয়েছে তা তো আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। দু' দলেরই স্কোরার স্কোর রেখেছে, কেউ তো আমাদের কাছে এই নিয়ে কমপ্লেন করেনি, সুতরাং আমাদের কিছুই করার নেই।"

কলাবতীর মনে হল ময়দানে আর তার থাকার দরকার নেই। শরীর ক্লান্তিতে ভরে উঠেছে। সারাদিনই ফিল্ড করে স্কোরবোর্ডে ৩০০—০ দেখার মতো এখন তার মনের অবস্থা।

কলাবতী সি এস জে সি-র কাঠের ফটক ঠেলে ঢুকেই দেখল, তাঁবুর বাইরের বাগানে খদ্দরের পাঞ্জাবি-ধুতি-পরা কৃষ্ণপদ ভটচাজ একটা চেয়ারে বসে।

"তোমার জন্যই চলে এলুম। একে নতুন, তায় মেয়ে, চেনা পরিচয়টা করিয়ে না দিলে কেউ তো তোমায় পাত্তা দেবে না। ....এই যে রূপায়ণ, এদিকে আয়।" কৃষ্ণপদ, প্রচুর দাড়িওলা, চশমাপরা একজনকে ডাকল। "একে চিনিস? এর নাম কলাবতী সিংহ, আমাদের কাগজে স্পোর্টসে জয়েন করেছে। আজই প্রথম মাঠে এল। ভাল ক্রিকেট খেলে, ভাল লেখে।"

"তাই নাকি? কাল তা হলে তো বঙ্গবাণী পড়তে হবে।"

কলাবতী শুনে খুশি হল, আবার ভয়ও পেল। তার লেখা পড়ে যদি হাসে! যদি বলে কাঁচা, ছেলেমানুষি, কিস্‌সু বোঝে না!

কৃষ্ণপদ আর-একজনকে ডাকল, "অ্যাই দেবাশিস, শুনে যা।"

"কেষ্টদা এক মিনিট।" কালো রং, দাড়িহীন, সরু গোঁফের লোকটি একজনের সঙ্গে কথা বলছে। কৃষ্ণপদ তখন ফিসফিসিয়ে



কলাবতীকে জিজ্ঞেস করল, "মাঠে গেছলে তো?"

"হ্যাঁ, দুটো মাঠে খেলা দেখেছি।"

"কিছু পেলে? লেখার মতো?"

"হ্যাঁ পেয়েছি। প্রথম মাঠে..." কলাবতী থমকে পড়ল কৃষ্ণপদর ঠোঁটে তর্জনীর চাবি দেখে।

"চুপ। রূপায়ণ, দেবাশিস, ওই যে সুপ্রিয়, এদের সামনে একদম মুখ খুলবে না। যা খবর পাবে পেটের মধ্যে রাখবে। এটা হল সাংবাদিকতার ফার্স্ট লেস্‌ন। কাউকে কোনও খবর সাপ্লাই করবে না।"

"কী সাপ্লাই করবে না কেষ্টদা?...আরে তুমি তো কলাবতী সিন্‌হা?" দেবাশিস এগিয়ে এসে বলল।

"কী করে চিনলি একে?" কৃষ্ণপদ পালটা প্রশ্ন করল।

"ওকে তো খেলতে দেখেছি, দাঁড়াও-দাঁড়াও..." দেবাশিস তর্জনী দিয়ে কপালে চারটে টোকা মেরে স্মৃতির ভাণ্ডারের ঢাকনা খুলে বের করে আনল, "গত বছর এই ইডেনেই, ফার্স্ট বলেই তো তুমি বোল্ড হয়েছিলে? ইয়েস, ইয়েস, বোলার ছিল ডায়না এদুলজি। আমি অবশ্য মেয়েদের ক্রিকেট দেখি না, একটা কাজে মিনিট দশেকের জন্য গিয়ে পড়েছিলুম। ফার্স্ট বলেই...অ্যাম আই কারেক্ট?"

কলাবতীর শ্যামলা রঙের মুখ লজ্জায় পলকের জন্য বেগুনি হয়ে উঠল। মুখে হাসি টেনে বলল, "হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট।"

"এক মিনিট।" দেবাশিস ব্যস্ত হয়ে টেন্টের ভেতর ঢুকে গেল। কলাবতী মুখ নামিয়ে কীভাবে তার রিপোর্ট শুরু করবে, তাই ভাবতে লাগল।

কৃষ্ণপদর মনে হল, প্রথম বলেই বোল্ড হওয়ার লজ্জায় কলাবতী হয়তো মনমরা হয়ে পড়েছে। তাকে চাঙ্গা করার জন্য

বলল, "আরে, প্রথম বলে কে না আউট হয় ? গাওস্কর হয়নি ? এই ইডেনেই তো মার্শালের বলে হয়েছে। আর গোল্লা করা ? জানো, একবার ডবলু. জি. গ্রেসের কাছে এক ছোকরা খুব লম্বা-লম্বা বাত ঝাড়ছিল। সে নাকি দারুণ ব্যাট করে, বড়-বড় স্কোর করেছে। অনেকক্ষণ শুনে গ্রেস জিজ্ঞেস করলেন, 'কখনও গোল্লা করেছ ?' ছোকরা বুক ফুলিয়ে বলল, 'জীবনে শূন্য রানে আউট হইনি।' গ্রেস শুনে বললেন, 'তা হলে ক্রিকেটের কিছুই তো শেখোনি।' বুঝলে কলাবতী, গোল্লা করার খুব প্রয়োজন আছে। তা হলে ওটাকে একশো করার জন্য তুমি চেষ্টা করবে। তাই না ?"

কলাবতী মাথা নেড়ে সায় দিল।

"তুমি এখন অফিসে চলে যাও। রেজাল্ট-ফেজাল্ট আমি নিয়ে যাব'খন। আমার পৌঁছনোর জন্য অপেক্ষা কোরো না, তুমি লিখে রেখে দিয়ে চলে যেয়ো, আমি রেজাল্টগুলো তলায় জুড়ে দেব।"

বঙ্গবাণীর খেলার বিভাগে পৌঁছে সে কাউকেই দেখতে পেল না। অবশ্য সেজন্য তার কোনও অসুবিধে হল না। কৃষ্ণপদ যা বলে দিয়েছিল, কলাবতী তাই করল। দুটো মাঠে যা দেখেছে, শুনেছে এবং বুঝেছে সেগুলো যথাসাধ্য গুছিয়ে ঝাঁঝালো ভাষায় লিখে, অবশেষে আক্ষেপ জানিয়ে শেষ করল, "নীচের দিকে যদি এইভাবে খেলা হয়, বনিয়াদটাই যদি ভেজাল দিয়ে তৈরি হয় তা হলে এর পর সুউচ্চ অট্টালিকা কখনওই তৈরি করা যাবে না।" প্রায় এক কলামের একটা রচনা লিখে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে সে বাড়ি চলে গেল।

রাত্রে রাজশেখরকে সে সবিস্তারে মাঠের অভিজ্ঞতা জানিয়ে বলল, "দাদু, তোমার সামার গেম্‌স আর গুড ডেজ যেখান থেকে বের করেছ, আবার সেখানেই তুলে রেখে দাও। আমার আর



কার্ডাস পড়ার দরকার নেই।"

"সে কী রে ! আমি যে দু'দিন ধরে কত ভাল-ভাল জায়গা অনুবাদ করে রাখলাম, তার কী হবে ?" সত্যশেখর আক্ষেপ জানিয়ে বললেন, "বাংলার ক্রিকেট সুউচ্চ অট্টালিকা না হোক, তোর লেখাটা তো চোখে পড়ার মতো উচ্চ দরের হতে পারবে।"

পরদিন ভোরবেলায় রাজশেখরের সঙ্গে জগিং সেরে বাড়ি ফিরেই কলাবতী দেখল কাকার হাতে বঙ্গবাণী, কিন্তু মুখটা বিমূঢ়। কাগজটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কলাবতী দ্রুত খেলার পাতাটা খুলল। ছাপার অক্ষরে তার লেখা বেরিয়েছে। হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ মানুষ তা পড়বে। নাই-বা তার নাম দিয়ে বেরোল, কিন্তু খেলার নামে যা চলছে তার একটা আংশিক ছবি তো সে তুলে ধরেছে। কত লোক প্রশংসা করে বলবে, এমন লেখাই তো চাই ! প্রতিশ্রুতিমানরা কীভাবে নষ্ট হয়, সেটা তো নিজের চোখে বাগচিকে দেখেই তো লিখেছে।

কিন্তু তার লেখাটা কোথায় ? কলাবতীর মাথায় এবার ভেঙে পড়ল যেন বাংলার ক্রিকেটের 'সুউচ্চ অট্টালিকাটাই'। তার লেখাটা কোথায় ? "ঝড়ের মতো শত রান" হেডিং দিয়ে লম্বা এক কলামের লেখায় 'স্টাফ রিপোর্টার' শুরু করেছে, "রবিবার ওয়াই এম সি এ মাঠের ওপর ঝড় বয়ে গেল। মাত্র ৪৪ বলে সবুজ পাতার ইন্দ্রজিৎ তালুকদার কদমতলার বোলিং তছনছ করে শতরানে পৌঁছন। মরসুমে এটি তাঁর পঞ্চম শতরান। ২৩টি বাউন্ডারি ও তিনটি ছক্কা মেরে তিনি শেষপর্যন্ত ১২৪ রানে অপরাজিত থেকে যান। বাংলার রঞ্জি দলের ভঙ্গুর মিড্‌ল অর্ডার ব্যাটিংয়ে ইন্দ্রজিতের মতো ব্যাটস্‌ম্যানই যে এখন দরকার সে-কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।" কিন্তু তার লেখাটার একটা বাক্যও তো এতে নেই। সে শুরু করেছিল, "বাংলার রঞ্জি দলে

কেন অন্য রাজ্যের খেলোয়াড়দের সংখ্যা বাড়ছে তার প্রকৃষ্ট এক কারণ রবিবার ওয়াই এম সি এ মাঠে দেখা গেল। ইন্দ্রজিৎ তালুকদার মরসুমে তার পঞ্চম লিগ শতরানটি ৪৪ বলে করলেন কদমতলা ফ্রেন্ডসের ফুলটস ও শর্ট পিচ বলের ভর্তুকি দ্বারা। বাংলা দলে ইন্দ্রজিতকে এর পর নেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই জোর দাবি উঠবে।"

কলাবতী ফ্যালফ্যাল চোখে কাকার দিকে তাকাল। সত্যশেখরেরও সেইরকম অবস্থা।

"লেখাটা কাল টেবলে রেখে চলে এসেছিস। উড়েটুড়ে মানে হারিয়েটারিয়ে যায়নি তো?" ঢোক গিলে সত্যশেখর বললেন।

কলাবতী মাথা নাড়ল, "পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রেখে এসেছিলুম।"

"তা হলে?"

কলাবতীর চোখ দিয়ে দরদর করে জল নেমে এল। তার প্রথম সাংবাদিকতা প্রয়াস ছাপার মুখ আর দেখল না।

"তুমি নিশ্চয় মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছ।" কৃষ্ণপদ তার পাশে বসা গম্ভীর মুখ কলাবতীকে একগাল হেসে বলল, "আরে সাংবাদিকতার এটাই তো ফার্স্ট লেসন্। খবরের কাগজে আগে থাকবে খবর। সাহিত্যফাহিত্য, মন্তব্য, উপদেশ, পরামর্শ থাকবে...অবশ্যই থাকবে, কিন্তু পরে। তুমি পরেশ কি সুব্রতকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো।"



"আবার আমায় নিয়ে কেন টানাটানি করছ কেষ্টদা।" সুব্রত কপি লিখতে-লিখতে কলাবতীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আবার বলল, "লেখাটা ফেলে না দিয়ে ওকে তো বলতে পারতে এটাকে কিছু এধার-ওধার করে একটা ফিচারের মতো লিখে দাও। আমাদের তো মাঝে-মাঝে ম্যাটার শর্ট পড়ে যায়, তখন ওটা চালিয়ে দেওয়া যেত।"

"তা অবশ্য বলতে পারতুম।" কৃষ্ণপদ তার ডান দিকের চুল আলতো দুটো থাপ্পড়ে চেপে বসাল। "তা হলে কলাবতী তুমি আরও দু-একটা ম্যাচ দেখে ফিচার গোছের একটা লেখা লিখে ফেলো। ছোট করে লিখবে। তোমার লেখাটা এত বড় করে ফেলেছিলে, যেন ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালের রিপোর্ট করছ। লেখাটার আকার দেখেই তো বুঝে গেছলুম বাদ দিতে হবে।"

"তা হলে এবার কোন ম্যাচটায় যাব?" শুকনো গলায় কলাবতী জানতে চাইল।

"পরেশ, ফিকশ্চারটা দে তো।"

টাইপ করা একটা কাগজ পরেশ ফাইলবক্স থেকে বের করে দিল। কৃষ্ণপদ ভ্রূ কুঁচকে সেটার দিকে তাকিয়ে বলল, "বড় টিমের ম্যাচ থেকে ফিচারের মেটিরিয়াল পাবে না তুমি, সেকেন্ড ডিভিশনের ম্যাচই বরং করো। শনিবার বাগুইহাটি স্পোর্টিং নিজেদের মাঠে খেলবে কদমতলা ফ্রেন্ডসের সঙ্গে। কাঁকুড়গাছি থেকে তোমার যেতেও সুবিধে হবে।"

"মাঠটা কোথায় কেষ্টদা?"

"মাঠটা?" কৃষ্ণপদর চুলের ওপর ঘরের ছাদ যেন ভেঙে পড়ল। "তাই তো? পরেশ বাগুইহাটির মাঠটা কোথায় রে?"

"আমি কী করে জানব! আমি কি ক্রিকেট করি?" পরেশ প্যাড থেকে একটা কাগজ প্রবল বিরক্তি নিয়ে ছিঁড়ল।

"কোথা থেকে কোথা থেকে সব ক্লাব যে সি এ বি ধরে আনে ! হ্যাঁ রে সুব্রত— ।" কৃষ্ণপদ বিপন্ন চোখে তাকাল ।

"তোমায় ভাবতে হবে না, কলাবতী ঠিক খুঁজে বের করে নেবে । বাগুইহাটির মোড়ে বাস থেকে নেমে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই সে বাতলে দেবে ।" সুব্রত লেখা থেকে মুখ না তুলে বলল ।

"সাংবাদিকতার ফার্স্ট লেস্‌ন হল এটাই, অজানাকে খুঁজে বের করা ।" কৃষ্ণপদ হাই তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল ।

বাড়ি ফিরতেই মুরারি জানাল, "বড়দি তোমাকে ফোন করেছিলেন । কী দরকার সেটা আর বলেননি । তোমাকে ফোন করতে বলেছেন ।"

"কাকা কোথায় ?"

"নীচে, চেম্বারে । ওঁর কাছেই ফোনটা এসেছিল ।"

"মক্কেল রয়েছে ?"

"তিনটে লোককে তো দেখেছিলুম ।"

দোতলার ফোনটা দিনসাতেক হল মরে রয়েছে । কাকার চেম্বারের ফোন ব্যবহার করতে কলাবতী নীচে নেমে এল ।

সত্যশেখর ঘরে একা এবং টেবিলের ওপর সাজানো তিন শালপাতা আলুকাবলি । তাকে দেখে সত্যশেখর ব্যস্ত হয়ে বললেন, "লোকগুলো এসে আর ওঠেই না...নে । শুরু কর । বেশি আর খাব না, চারটে হয়ে গেছে ।"

"বড়দি ফোন করেছিলেন ?"

"হুঁ ।" শালপাতাটা চেটে নিয়ে সত্যশেখর বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেললেন । কলাবতীকে ডায়াল করতে দেখে তিনি অবাক হয়ে বললেন, "এগুলো ফেলে তুই আজেবাজে ফোন করতে শুরু করলি ?"



"বড়দি আজেবাজে ?"

"এই আলুকাবলি আমার জন্য আলাদা করে তৈরি করিয়ে আনে মুরারি । এর কাছে তোর বড়দি ?"

কলাবতী উত্তর দিতে যাচ্ছে, তখন ফোনে ওধার থেকে গম্ভীর পুরুষ গলা বলে উঠল, "হ্যালও ।"

গলাটা চিনতে পারল কলাবতী । "কে হরিদাদু, আমি কালু বলছি ।"

"কী খবর তোমার, ভাল আছ তো ? বাড়ির সবাই, সতু, রাজু ভাল আছে ?"

"আছে ।"

"মলুর কাছে শুনলাম, তুমি নাকি বঙ্গবাণীতে স্পোর্টস রিপোর্টিং করছ ? আর কী কাগজ পেলে না ? ওর এডিটর তো সদানন্দ ঘোষ, আমাদের ওদিককারই ছেলে । ওর বাবা স্কুলে বাংলা পড়াত । সদানন্দ তো এককলম বাংলাও লিখতে পারে না, ওর কাগজে তুমি কী লিখবে ? যে বাংলা শিখেছ সেটাও ভুলে যাবে । কার বুদ্ধিতে ওখানে গেলে, নিশ্চয় রাজুর ।"

কলাবতী সন্ত্রস্ত এবং হুঁশিয়ার হয়ে গেল । "না, না, দাদুর তো ভীষণ আপত্তিই ছিল । ঠিক আপনার মতোই বলেছিলেন, সদানন্দ তো এককলমও বাংলা লিখতে পারে না, ওর কাগজে লিখলে ..." কথাটা শেষ করতে পারল না সে ।

"কী বললে ?" হরিশঙ্কর মুখুজ্জে হুঙ্কার ছাড়লেন, "রাজু এ-কথা বলেছে ? ও বাংলার বোঝেটা কী ? ও তো বিদ্যাসাগর মশায়ের 'উপক্রমণিকা' পড়েনি, পড়েছে নেসফিল্ড । সদানন্দর বাংলা বোঝার যোগ্যতা ওর আছে ? সম্পাদকীয়গুলো পড়ে দেখো, কী ওজঃ কী ঝঙ্কার, আমি তো ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গলা শুনতে পাই ওর লেখা থেকে.... খুব ভাল করেছ তুমি... এই যে

মলু এসে গেছে, ধরো।"

"কে, কালু?"

"হ্যাঁ, বড়দি।"

"ফোন করেছিলুম একটা ব্যাপারে। তুমি তো বঙ্গবাণীর স্পোর্টসে জয়েন করেছ। আমার মামাতো দাদার মেয়ে ঝুপু টেনিস খেলে, ওকে নিয়ে তুমি লিখতে পারো। দিনরাত পরিশ্রম করছে। স্টেফি গ্রাফ, সাবাতিনি, এরাই ওর আদর্শ। ওদের মতো হতে চায়। প্রভাতদা, বউদি ওঁরাও খুব চেষ্টা করছেন। তুমি এদের নিয়েও লিখতে পারো।"

"ওঁরা থাকেন কোথায়?"

"লিলুয়ায়। দাদা ওয়েলিংটন জুট মিলে বড় চাকরি করেন। বউদি কাল এসেছিলেন। কথায়-কথায় আমি বললুম, আমার এক ছাত্রী খবরের কাগজে স্পোর্টস রিপোর্টার।"

"না বড়দি, আমি ঠিক রিপোর্টার নই। টুকটাক কাজ শিখছি, চাকরি করি না।" কলাবতী ভুল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করল।

"ওই হল। তুমি লিখলে সেটা কাগজে বেরোবে।"

"না বড়দি, তার কোনও গ্যারান্টি নেই।"

"তা হলে, প্রভাতদার মেয়ের কথা তোমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়?" হতাশা ফুটে উঠল মলয়া মুখার্জির গলায়।

"বড়দি, আমি বরং মেয়েটিকে আগে একবার দেখি। ও খেলে কোথায়, সাউথ ক্লাবে? কোনও টুর্নামেন্ট জিতেছে?"

"তা তো আমি বলতে পারব না। ওদের কোয়ার্টারটা বেশ বড়, সঙ্গে অনেকটা জমি আছে, হয়তো সেখানেই খেলে। বউদি তো তোমার কথা শুনে লাফিয়ে উঠলেন। একটু পাবলিসিটি পেলে নাকি ঝুপু খুব উৎসাহ বোধ করবে, তা ছাড়া স্পনসরার পেতেও সুবিধে হবে। তুমি যদি যাও তো বাড়িতে ওঁরা গাড়ি



পাঠিয়ে দেবেন।"

"না, না, ওসব নয়। লিলুয়া স্টেশন থেকে আমায় তুলে নিলেই হবে। আমি বুধবার তিনটে নাগাদ হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠব। ওঁদের এটা জানিয়ে দিন।"

"এখনই ফোন করছি। বলে দিচ্ছি পরশু তিনটে থেকে যেন গাড়ি নিয়ে সবুজ সালোয়ার কামিজ পরা একটা মেয়ের জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করে।"

ফোন রেখে সে সত্যশেখরের দিকে তাকাল। টেবলের তিনটি শালপাতা নেই।

"কী করব, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। এত ভাল জিনিস!"

বুধবার লিলুয়া স্টেশনের বাইরে এসে কলাবতী হাতঘড়িতে দেখল সাড়ে তিনটে বাজে। সবুজ একটা মারুতি দেখে তাকানো মাত্র গাড়ির পেছনের জানলা থেকে এক মহিলা হাত বাড়িয়ে নাড়লেন। ড্রাইভারও হর্ন বাজাল। গাড়ির পেছনের দরজা খুলে ধরে কৃতার্থ হওয়ার মতো গলায় মহিলা বললেন, "সবুজ সালোয়ার কামিজ দেখেই বুঝে গেছি। আমি মলুর বউদি ছবি চ্যাটার্জি....বেশিক্ষণ লাগবে না, মিনিট-দশেকের রাস্তা ... উনি আসতে পারলেন না, লেবারদের ঝামেলা চলছে। এখন মিলে রয়েছেন, আমাকে বললেন তোমাকে রিসিভ করতে। আচ্ছা, বঙ্গবাণী তো বেশ বড় কাগজ, এখন সার্কুলেশন কত, লাখ চার-পাঁচ হবে?"

ফাঁপরে পড়ল কলাবতী। সে সত্যিই জানে না বঙ্গবাণীর বিক্রয়-সংখ্যাটা কত। তার অনুমান, লাখ দেড়েকের বেশি নয়। কিন্তু তার মনে হচ্ছে দেড় লাখ বললে ছবি চ্যাটার্জি খুবই হতাশ হবেন, খাতিরটাও কমিয়ে দেবেন।

"এখন ছ' লাখের কাছাকাছি।"

"ছ-অ-অ-অ লাখ!" পুলকিত বিস্ময়ের ধাক্কায় ছবি চ্যাটার্জি অনর্গল কথা বলতে শুরু করলেন।

"জানলে, আমিও একসময় খুব খেলাধুলো করতুম। সাঁতার কাটতুম, দৌড়তুম, গাছে চড়তুম... গাছে চড়াটাও তো একটা খেলা, তাই না? চোর-পুলিশ, গাদি, কানামাছি, কতরকমের যে খেলা খেলেছি! কিন্তু কোনও খেলাতেই উঁচুতে আর উঠতে পারলুম না। এই আক্ষেপটা আজও আমার রয়ে গেছে। উনিও বড় টেনিস প্লেয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। কলেজে পড়ার সময় খেলতেন। কিন্তু কেরিয়ারের কথাটা তো ভাই আগে ভাবতে হবে। উইম্বলডন জিতবেন ভাবতেন, সেই সাধ আর পূর্ণ হল না।"

ছবি চ্যাটার্জির বয়স, কলাবতীর মনে হল, বড়দির চেয়ে অনেক কম, বড়জোর পঁয়ত্রিশ। কিন্তু দেহের ওজনে বড়দির থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোগ্রাম বেশিই হবেন। মুখটি সুন্দর, যাকে লক্ষ্মী প্রতিমার মতো বলা যায়, দুধে-আলতা গায়ের রং। ধনীর কন্যা এবং দর্শনশাস্ত্রের এম. এ.। কলাবতী চ্যাটার্জিদের সম্পর্কে যথাসাধ্য হোমওয়ার্ক করেছে লিলুয়া রওনা হওয়ার আগে। কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে, ভস্মে ঘি ঢেলেছে।

"আমাদের অপূর্ণ সাধ, আকাঙ্ক্ষা এখন ঝুপুকে দিয়ে আমরা মেটাতে চাই। উনি গাদা-গাদা বই কিনছেন আর রাতদিন পড়ছেন। সব টেনিসের বই। কোচিংয়ের বই, স্পোর্টস সাইকোলজির বই, স্পোর্টস মেডিসিনের বই, বড়-বড় প্লেয়ারদের জীবনী, শোবার ঘরের চারটে তাক বইয়ে ভরে গেছে। ঝুপুও খুব খাটে। তবে ওর সম্পর্কে কাগজে কিছু বেরিয়েছে দেখলে উৎসাহটা বাড়বে, আরও খাটবে। ও বড় হলে সেটা তো দেশেরই

বড় হওয়া, খবরের কাগজের এই দিকটা, মানে দেশের গৌরবের দিকটা তো দেখা উচিত, ঠিক কিনা? তুমি আসবে শুনে কালই ওর গোটা তিরিশ ছবি তোলানো হয়েছে, তোমার তো লেখার সঙ্গে লাগবে?"

কলাবতী আগাগোড়াতেই হুঁ-হুঁ করতে-করতে অবশেষে উঁচু পাঁচিল-ঘেরা কোয়ার্টারের ফটকে পৌঁছল। একতলা বাংলো বাড়ি। মোরাম-ঢাকা পথ ফটক থেকে ঢাকা বারান্দা পর্যন্ত, দু'ধারে মরসুমি ফুল আর চন্দ্রমল্লিকা। কলাবতীর চোখ মুগ্ধ হয়ে গেল এবং তারপরই বিস্ময়ে গোলাকার। বাংলোর পশ্চিমে, ফ্রকপরা ছোট্ট একটি মেয়ে, হাতে একটা টেনিস র‍্যাকেট, যার হাতলটার

আধখানাই কেটে বাদ দেওয়া, কৌতূহলী চোখে তার দিকেই তাকিয়ে। চোখাচোখি হতেই মেয়েটি দ্রুত চোখ সরিয়ে নিল। তারপর থামিয়ে রাখা কাজটা শুরু করল—বাঁ হাতের টেনিস বলটা শূন্যে ছুড়ে র‍্যাকেট দিয়ে মারল। বাংলোর দেওয়ালে লেগে বলটা ফিরে আসতেই ভলি করল। এইভাবে সে জমিতে বল পড়তে না দিয়ে ক্রমান্বয়ে ভলি মেরে যেতে থাকল, ডাইনে-বাঁয়ে সরে অথবা পিছিয়ে গিয়ে।

কলাবতী লক্ষ করল মেয়েটি একবারের জন্যও বল থেকে চোখ সরাচ্ছে না। ভ্রূ কুঁচকে, গালের পেশি শক্ত করে মনপ্রাণ নিজের কাজে ঢেলে সে বল মেরে যাচ্ছে। কখনও যদি বল ফসকাচ্ছে, পাশেই রাখা একটা প্লাস্টিকের বালতি থেকে বল তুলে নিয়ে আবার শুরু করছে। সময় নষ্ট হচ্ছে না।

"ঝুপু এখন ভলি প্র্যাকটিস করছে।" ছবি ফিসফিস করে গোপন খবর জানাবার মতো গলায় বললেন। "সাড়ে তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত ভলি সেশন, দেড়শো ভলি।"

"দেএএএড় শোওও!" কলাবতী অনেকটা 'ছঅঅঅ লাখ'কে নকল করে বলল। শুনে আত্মপ্রসাদের হাসি ছড়িয়ে পড়ল শ্রোতার মুখে। "তিন মাস পর ওটা দুশো হবে।"

"দুউউ শো!"

"তারপর আধঘণ্টা চলবে ব্যাক হ্যান্ড। দু' হাতে র‍্যাকেট ধরে মানে টু ফিস্টেড ব্যাক হ্যান্ড, যেভাবে মোনিকা সেলেস মারে, তুমি দেখেছ তো?"

"টিভিতে দেখেছি। আধঘণ্টায় ঝুপু ক'টা মারবে?"

"পঞ্চাশটা। আমরা সপ্তাহের ট্রেনিং শিডিউলই ওকে লিখে দিই। গত হপ্তায় মেরেছে পঁয়তাল্লিশটা। তিন মাস পর এটা হবে একশো দশ। ব্যাক হ্যান্ডের পর পনেরো মিনিট রেস্ট। তখন



ওর ঘাড়ে-হাতে ম্যাসাজ করে দিই।"

"ট্রেনিংয়ের সময় কেউ লক্ষ করেন না, ঠিকমতো হচ্ছে কিনা?" বলতে-বলতে কলাবতী তার ঝোলা থেকে নোটবই আর কলম বের করল।

"কেন, আমি থাকি। ওই যে, ওখানে বসে দেখি।" কলাবতীকে টুকতে দেখে ছবি চ্যাটার্জি প্রচণ্ড উদ্দীপনা নিয়ে বললেন।

কলাবতীকে টুকতে দেখে ছবি চ্যাটার্জি প্রচণ্ড উদ্দীপনা নিয়ে বললেন।

ঝুপুর পেছনে একটা বড় রঙিন বাগানছাতা আর চেয়ার কলাবতী আগেই দেখেছে। তার পেছনে নিকোনো মাটির একটা ছোট টেনিস কোর্ট, যাতে চুন-গোলা দিয়ে দাগ টানা। কোর্টে নেট খাটানো রয়েছে।

"পেছনে বসে ওকে উৎসাহ দিয়ে যান?"

"বল গার্লদের মতো বলও কুড়িয়ে দিই। উফ্‌ফ কী যে পরিশ্রম করতে হয় মেয়ের জন্য, সে তো তুমি বুঝবে না ভাই।"

"কোর্টটা মাটির কেন?"

কথাটা শুনে ছবি চ্যাটার্জির যেন শ্বাসকষ্ট শুরু হল। "বলছ কী ভাই! ঘাসের কোর্ট পৃথিবীতে আর ক'টা, সবই তো ক্লে কোর্ট! উইম্বলডন ছাড়া সার্কিটে আর ঘাস কোথায়?"

কলাবতী মনে-মনে জিভ কামড়াল। বড্ড ভুল প্রশ্ন সে করে ফেলেছে। এখন থেকেই ঝুপু মাটির কোর্টের সঙ্গে সড়গড় না হলে গ্রাফ কি সেলেসের সঙ্গে লড়বে কী করে।

"কম খরচ হয়েছে? তিন লরি মাটি, সেইসঙ্গে গোবর, খোল, আরও কত কী!"

ঝুপু সমানে ভলি মেরে চলেছে। একজন অপরিচিত যে দূর

থেকে লক্ষ করছে এটা সে গ্রাহ্যেই আনছে না। বয়স বড়জোর নয়-দশ। মায়ের মতোই রং এবং মুখের গড়ন। ছোট চুল স্টেফি গ্রাফের মতো ঘাড়ের কাছে রিবন বাঁধা। পা দুটি লম্বা এবং সুগঠিত।

"শুধু একা-একা ট্রেনিংই করে যাচ্ছে ? ম্যাচ খেলে না ?"

"ওর বাবা রোজ সকালে বেরোবার আগে এক ঘণ্টা ওর সঙ্গে খেলেন।"

"আপনাদের দু'জনকেই খুব খাটতে হয়।"

"নিশ্চয়। চলো ভেতরে গিয়ে বসি। ঝুপু আজ আর ব্যাকহ্যান্ড করবে না। তোমার তো ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে।"

"না, তেমন কিছু প্রশ্ন আমার নেই।" কলাবতী এগোল ছবি চ্যাটার্জির সঙ্গে। বারান্দা থেকে বসার ঘরে ঢুকেই সে থ' হয়ে গেল। ঘরটা তো টেনিস পোস্টারের প্রদর্শনী ! দেওয়ালে এক ইঞ্চিও খোলা জায়গা নেই। জিমি কোনর্স, বর্গ, এভার্ট, নাভ্রাতিলোভা থেকে সাম্প্রাস আর কাপ্রিয়াতি পর্যন্ত প্রায় কুড়ি বছরের সব নামীদের রঙিন ছবি।

"এরা সবসময় চোখের সামনে থাকলে ঝুপু প্রেরণা পাবে।" সোফায় বসলেন ছবি চ্যাটার্জি। সামনের সোফায় কলাবতী।

ঘরে ঢুকল ঝুপু। মায়ের আঙুলের নির্দেশে কলাবতীর পাশে বসল। মুখটা নামানো। ঘামে ভেজা ঘাড়ের চুল চামড়ায় সেঁটে রয়েছে। একে কী জিজ্ঞেস করবে ?

"তুমি কোন ক্লাসে পড়ো ?"

ঝুপু মায়ের দিকে তাকাল।

"সারাদিনটাই তো ওর ট্রেনিং শিডিউলে ভরা। পড়বার সময় কোথায় ? রেস্ট নেওয়াটাও খুবই দরকার, তাই ওকে স্কুলে দিইনি। আমিই বাড়িতে পড়াই।"



"তোমার বন্ধুরা কী বলে তোমার এই টেনিস খেলা নিয়ে ?"

ঝুপু মাথা নেড়ে অস্ফুটে বলল, "বন্ধু নেই।"

"বুঝলে ভাই, বেশি বন্ধুটন্ধু থাকলে তখন হইচই করার দিকেই মন চলে যাবে, তাই আমি ওকে মিশতে-টিশতে দিই না। ঠিক করিনি ?"

কলাবতী চুপ করে রইল।

"এখনকার দিনে মানুষ খাটে তো টাকা রোজগারের জন্যই। স্টেফি গ্রাফ বাইশ বছর বয়সেই এক কোটি দশ লক্ষ ডলার শুধু প্রাইজমানিই জিতেছে। টাকায় এটা কত হয় বলো তো ? ঝুপুর বাবা হিসেব করে দেখেছে, প্রায় তেত্রিশ কোটি টাকা ! চার বছর বয়সে বাবা স্টেফির হাতে র‍্যাকেট তুলে দিয়েছে বলেই তো আজ সে এত বড় হয়েছে, এত টাকা করেছে। ঝুপুর হাতে র‍্যাকেট আমরা দিয়েছি, গত বছর, ওর ন' বছর বয়সে। আমি বলছি না বারো বছর পর ও তেত্রিশ কোটি টাকার মালিক হবে। কিন্তু কিছু তো হবে...কুড়ি কোটি... পনেরো কোটি... দশ কোটি ?" ছবি চ্যাটার্জি উত্তেজিত হয়ে সামনে ঝুঁকে টেব্‌লে চড় বসালেন। "এর সঙ্গে বড়-বড় কোম্পানির প্রোডাক্টের এনডোর্সমেন্ট থেকে পাওয়া আরও দশ কোটি যোগ করো। আসলে কী জানো, খরচ করা আর লেগে থাকা এই দুটো না হলে কিছু হয় না। তিন থেকে পাঁচ বছর ফ্লোরিডায় কি ক্যালিফোর্নিয়ায় কোনও টেনিস অ্যাকাডেমিতে ঝুপুকে রাখা দরকার। কিন্তু খরচের কথা ভেবে আমরা এসব চিন্তা ত্যাগ করেছি। স্পনসরার পেলে অবশ্যই ওকে পাঠাব। তুমি ভাই সেইভাবে লিখো যাতে স্পনসরাররা এগিয়ে আসে।"

কলাবতী আড়চোখে ঝুপুকে দেখল। মাথাটা হেলিয়ে সে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝেয় আঁক কাটছে। চোখের ভাব ঘুমে জড়িয়ে আসার মতো। কলাবতীর ইচ্ছে করল বুকের কাছে

টেনে মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে বলতে—'ছুট্টে এই বাংলো থেকে বেরিয়ে সামনে যাকে পাবে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাও।'

ভেতরের ঘরে ফোন বেজে উঠল। ছবি চ্যাটার্জি "আসছি" বলে উঠে গেলেন। সেই ফাঁকে কলাবতী নিচুস্বরে ঝুপুকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার ভাল লাগে রোজ এইভাবে ট্রেনিং করতে?"

মেয়েটি শুধু তাকিয়ে রইল।

"বলো না, ভয় কী আমাকে বলতে?"

ভেতর থেকে ছবি চ্যাটার্জির গলা ভেসে এল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসেছে। তুমি কি এখন আসতে পারবে না?..."

কলাবতী আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমার স্কুলে যেতে ইচ্ছে করে না?"

ঝুপু মাথা হেলিয়েই সিধে করে নিল। তার মা ফিরে এসেছেন।

"ঝুপুর বাবার ফোন, মিলে আটকে পড়েছেন। বললেন ক্যাসেটটা তোমাকে শোনাতে।"

"কিসের ক্যাসেট!"

"ইন্টারভিউয়ের ক্যাসেট। টুর্নামেন্ট জিতলে রিপোর্টাররা যখন নানারকম প্রশ্ন করবে তখন ঝুপু কী উত্তর দেবে? ওর বাবা ইংরেজিতে আশিটা নানারকমের প্রশ্ন আর তার উত্তর নিয়ে ক্যাসেট তৈরি করেছে। রাত্তিরে ঘুমোবার আগে ঝুপু আধঘণ্টা ক্যাসেট শোনে আর মুখস্থ করে। উনি প্রতিদিন লাঞ্চ করতে এসে খাবার টেব্‌লে ওকে ইন্টারভিউ করেন। সব দিক থেকেই আমরা ওকে তৈরি করে যাচ্ছি। তোমাকে ক্যাসেটটা এনে..."

ওকে থামিয়ে কলাবতী বলল, "আজ থাক, আমার দেরি হয়ে যাবে ফিরতে।"



আবার ফোন বেজে উঠল।

"আহ্, একটু কথা বলতেও দেবে না, আসছি ভাই।"

ছবি চ্যাটার্জি ঘর থেকে বেরোতেই কলাবতী ঝুপুর দিকে তাকিয়ে জিভ বের করে ভেংচি কাটল।

"তুমি গুপি গায়েন বাঘা বায়েন দেখেছ?"

"হ্যাঁ, টিভিতে।"

"ভূতের রাজা দিল বর, দিল বর।" সুর করে লাইনটা চাপা স্বরে গেয়ে উঠে সে বলল, "কেমন লাগে?"

"খুব ভাল।"

পাশের ঘর থেকে ভেসে এল, "আর বলবেন না মিসেস দাস, কোথা থেকে যে এরা ঝুপুর খবর পেল, একেবারে ফোটোগ্রাফার নিয়ে হাজির হয়েছে...।"

"অরণ্যদেব?"

ঝকমক করে উঠল ঝুপুর চোখ। "সকালে কাগজওলা কাগজ দিলেই আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে টুক্ করে পড়ে নিই।"

"তারপর কী করো?"

"বাবা সার্ভিস প্র্যাকটিস করায়।"

"কতক্ষণ?"

"পঞ্চাশটা।"

"করতে ভাল লাগে?"

"না।" বলেই মুখটা পাংশু হয়ে গেল ঝুপুর।

"রেলের এক অফিসারের বউ।" ঘরে ঢুকলেন ছবি চ্যাটার্জি। "মেয়ে ক্লাস ফোরে উঠেছে, ফার্স্ট হতে পারেনি তাই দুঃখ করছিল।... দুপুরে খেয়ে বেরিয়েছ, এতক্ষণে খিদে পাওয়ার কথা, একটু কিছু মুখে দাও। কোনও কথা শুনব না।"

কলাবতীর "না, না" উপেক্ষা করে তিনি ভেতরের দরজার

কাছে গিয়ে ডাকলেন, "বাসন্তী, নিয়ে এসো।"

সেই ফাঁকে কলাবতী ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি স্টেফি গ্রাফ হতে চাও?"

"না।"

"কী হতে ইচ্ছে করে?"

"ভূতের রাজা।"

ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল এক প্রৌঢ়া। এতরকমের খাবার! কলাবতী আঁতকে উঠে বলল, "করেছেন কী? সব কি আমার জন্য?"

"তা না হলে কার জন্য। আমার শরীর দেখছ তো, খাওয়া কমিয়েও কিছু হচ্ছে না, আর ঝুপুর তো এসব খাওয়ার কথাই নয়।"

কলাবতী লক্ষ করল, ঝুপুর জুলজুল চোখ খাবারের প্লেটগুলো চেটে গেল। তার পলকের জন্য মনে পড়ল কাকাকে। কী খুশিই না হত এই ট্রে-টা যদি সামনে পেত।

"মাংসের শিঙাড়া, চিংড়ির কাটলেট আর পুডিংটা আমার করা। ঝুপুর বাবা কাল নিউ মার্কেট থেকে পেস্ট্রি, আপেল, আঙুর, আর পেস্তার বরফি এনেছে।"

খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে কলাবতীর মনে হল, সে খুবই অন্যায় করবে এগুলো খেয়ে। মেয়েকে নিয়ে একটা লেখা খবরের কাগজে যাতে বেরোয় সেজন্য খাদ্যের আড়ম্বর দিয়ে এটা তাকে খুশি করার চেষ্টা। কিন্তু সে ঠিক করেই ফেলেছে এই দুর্ভাগা মেয়েটি সম্পর্কে একটি লাইনও লিখবে না।

"কিন্তু আমার তো এর সবক'টাই খাওয়া বারণ। বড়দি বোধ হয় আপনাকে বলতে ভুলে গেছেন, দিন সাতেক হল জনডিস থেকে উঠেছি, খাওয়াদাওয়া প্রচণ্ড রেস্ট্রিকটেড। সামান্য বেনিয়ম



হলেই আবার শুরু হতে পারে। আমায় মাফ করবেন।" কলাবতী ঝোলা কাঁধে উঠে দাঁড়াল।

"অন্তত একটা কিছু...।" ছবি চ্যাটার্জির কাতর স্বরে হতাশাটা স্পষ্ট।

"না। এবার আমি যাব।" কলাবতীর স্বরে এবং শরীরে কাঠিন্য ফুটে উঠল। ঘর থেকে বেরিয়ে সে বারান্দায় এল। মারুতিটা ফটকের সামনে অপেক্ষা করছে। পায়ে-পায়ে ঝুপু ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

"গাড়ি তোমাকে স্টেশনে দিয়ে আসবে। কিন্তু একটু কিছুও মুখে দিলে না, আমার খুব খারাপ লাগছে।"

"একটু ভাল হয়ে নিই, তারপর একদিন এসে প্রচুর খেয়ে যাব।" কলাবতী হাসল ঝুপুর দিকে তাকিয়ে। মেয়েটির চোখে আঞ্চর ঘুম-জড়ানো শ্রান্তি নেমে এসেছে।

"ওমমা, দেখেছ! আসল জিনিসটাই দিতে ভুলে গেছি।" ছবি চ্যাটার্জি ঘরের মধ্যে ছুটে গেলেন। তখন কলাবতী ঝুপুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ভূতের রাজা দেখতে কেমন জানো?"

"না।"

চোখ-মুখ কুঁচকে সে জিভ বের করে দেখাল। হন্তদন্ত হয়ে ছবি চ্যাটার্জি ফিরে এলেন হাতে একটা খাম নিয়ে। "ছবিগুলোই দিতে ভুলে যাচ্ছিলাম।"

খাম হাতে গাড়িতে ওঠার সময় কলাবতী একবার ফিরে তাকাল। বারান্দায় মায়ের পেছনে দাঁড়িয়ে ঝুপু, জিভটা বের করে।

ফেরার সময় তার মনে হয়েছে, যদি না লিখি তা হলে বড়দি কী ভাববেন? ওঁরা বড়দির আত্মীয়। বড়দি নিশ্চয় আশা করবেন, তাঁর আত্মীয়ের মেয়েকে নিয়ে কালু লিখবে। অথচ তার মন

একদমই রাজি হচ্ছে না এই লেখাটা লিখতে। একটা বিচিত্র ধরনের সঙ্কট।

বাড়ি ফিরেই সে ফোন করল। তার অসীম সৌভাগ্য, ফোন করার সময় চেম্বারে কাকা ছিল না এবং অপরপ্রান্তে ফোনটা হরিশঙ্কর নয়, ধরল মলয়াই।

"বড়দি আমি খুব মুশকিলে পড়ে গেছি। কী করব সেটা আপনিই বলে দিন।" কলাবতী মরিয়া হয়ে মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মলয়ার সাহায্য চাইল।

লিলুয়ায় যা দেখল এবং শুনল তার বিবরণ সংক্ষেপে জানিয়ে সে বলল, "বড়দি, ওঁরা নিজেদের অপূর্ণ মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য দশ বছরের একটা মেয়ের শরীর আর মনের ওপর রীতিমত অত্যাচার চালাচ্ছেন। এভাবে বোকার মতো কখনও খেলোয়াড় তৈরি করা যায় না। খেলাটা আপনা থেকেই আসে, একে জোর করে চাপিয়ে খেলোয়াড় বানানো যায় না, এটা একটা স্বতস্ফূর্ত ব্যাপার।

"ওঁরা মেয়েটাকে মেরে ফেলছেন, ওর জীবনটাকে নষ্ট করছেন। ট্যালেন্ট আছে কি নেই তা জানি না, তবে এখনই বলে দিতে পারি, ঝুপু কোনওদিনই টেনিস প্লেয়ার হবে না। বাবা-মা ওকে ঘিরে কোটি-কোটি টাকার স্বপ্ন দেখছেন, কী ভয়ঙ্কর স্বার্থপর! আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ঝুপুর জন্য।... বড়দি, আপনার আত্মীয় ওঁরা, আপনিই অনুরোধ করেছেন লেখার জন্য, কিন্তু লিখতে আমার মন চাইছে না। বড়দি, আমি তা হলে কী করব?"

কলাবতী শ্বাস প্রায় না নিয়েই একটানা কথা বলে তার ভেতরের উত্তেজনাকে মুক্তি দিল। কিন্তু ওধার থেকে কোনও সাড়াশব্দ আসছে না কেন! সে ভাবল, তা হলে বড়দি কি ক্ষুণ্ণ হলেন? হয়তো মামাতো দাদা-বউদিকে কথা দিয়ে ফেলেছেন তাঁর



ছাত্রীকে দিয়ে লিখিয়ে কাগজে ছাপিয়ে দেবেন। এখন সেই ছাত্রী লিখতে না চাওয়ায় নিশ্চয় রেগে গেছেন।

"বড়দি? হ্যালো..."

"কালু, একদিন ক্লাসে তোমায় কী বলেছিলাম তা মনে আছে?"

"কী বলেছিলেন?"

"যথার্থ যা দেখবে, শুনবে, বুঝবে, তাই লিখবে। ...কালু তুমি কিন্তু এই লেখাটা লিখবে না।" গম্ভীর থমথমে মলয়ার কণ্ঠস্বর। "মানবিক বোধ নষ্ট কোরো না। কিছু না লিখলেই বোধ হয় ঝুপুর উপকার করা হবে। আমি কালই লিলুয়ায় গিয়ে ওঁদের সঙ্গে কথা বলব। আর-একটা কথা... আমি খুব খুশি হয়েছি।"

ফোনটা রেখে কলাবতীর মনে হল, বুক থেকে যেন একটা পাষাণভার নেমে গেল।

দমদম এয়ারপোর্ট থেকে প্রধানমন্ত্রী আসবেন তাই নজরুল ইসলাম সরণিতে, যাকে সবাই ভি আই পি রোড বলে, গাড়ি চলাচল বন্ধ। কারণটা অবশ্যই নিরাপত্তার জন্য। তবে মিনিবাসে বসে থাকা কলাবতীর কাছে এটা নেহাতই বাড়াবাড়ি মনে হল। প্রধানমন্ত্রীর কনভয় যাবে তার জন্য আধঘণ্টা আগে গাড়ি-চলাচল কেন যে বন্ধ করা হবে, তার কোনও ব্যাখ্যা সে খুঁজে পাচ্ছে না।

আসলে তার দেরি হয়ে যাচ্ছে। বাগুইহাটি স্পোর্টিং মাঠে



www.boiRboi.blogspot.com

যাওয়ার জন্য সে সময়ের হিসেব করেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কলকাতা আগমন হলে এয়ারপোর্ট থেকে উল্টোডাঙা আর নজরুল সরণির মোড় পর্যন্ত ট্র্যাফিক বন্দোবস্তটা যে কেমন হয় সেটা তার জানা ছিল না। কনভয় যখন উল্টোডাঙা মোড় থেকে বাঁ দিকে বেঁকে ইস্টার্ন বাইপাস ধরল, তখন ছাড়া-পাওয়া গাড়িগুলো প্রতিযোগিতা শুরু করল, কে আগে যাবে। ফলে যানজট।

সুতরাং বাগুইহাটির মোড়ে সে যখন মিনিবাস থেকে নামল, তখন দশটা পঁয়তাল্লিশ। মাঠটা সাইকেল রিকশাওয়ালা চেনে। কলাবতীর আপাদমস্তক দেখে সে ভাড়া হাঁকল, চার টাকা। তাই সই বলে সে রিকশায় উঠে বসল।

দু'ধারে মাটি আর খোয়া, মধ্যে আরও ভাঙা, গর্ত হওয়া পিচ ঢালা পথ। ডাইনে-বাঁয়ে বাঁক নিয়ে, এ-গলি সে-গলি হয়ে মিনিট পাঁচেক যাওয়ার পর কলাবতী দেখল, সাদা ট্রাউজার্স আর শার্ট পরা তিনটি ছেলে হেঁটে আসছে। তাদের হাতে কিট ব্যাগ। একজনের হাতে ক্রিকেট ব্যাটও। ওদের দেখে সে আশ্বাস পেল, তা হলে রিকশায় ঠিক জায়গার দিকেই যাচ্ছে। কিন্তু এই সময় ওদের তো মাঠে থাকার কথা! কলাবতী ধাঁধায় পড়ল।

"আর কতদূর?" একটু উদ্বিগ্ন হয়েই সে জানতে চাইল। তাড়াতাড়ি মাঠে পৌঁছনোর থেকেও, গর্তভরা রাস্তায় রিকশার সওয়ার হওয়া থেকে তাড়াতাড়ি রেহাই পাওয়াটাই এখন তার কাছে কাম্য।

"আপনে অ্যাত ব্যস্ত হইতেছেন ক্যান? ঠিক জায়গায়ই লইয়া যামু। যেহানে কিরকেট খেলা হয়, সেই মাঠ ত?"

"হ্যাঁ।"

এক মিনিট পরই রিকশা থেকে কলাবতী একটা মাঠ দেখতে



পেল। মাঠের দু'দিক দিয়ে রাস্তা, বাকি দু'দিকে একতলা ছোট-ছোট পাকা বাড়ি। মাঠের মাঝখানে আড়াআড়ি পায়ে চলা একটা পথ পিচের ওপর দিয়ে চলে গেছে। তবে পিচের অংশটা দড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া। ক্রিকেট মরসুমে চলাচলের জন্য ওটাকে ঘুরে যেতে হয়।

কিন্তু পিচ ঘিরে এখন কেন দড়ি? রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে কলাবতী হতভম্ব হয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল। খেলা কোথায়? এটাই তো বাগুইহাটি স্পোর্টিংয়ের মাঠ!

মাঠের একদিকে সাত-আটটি ছেলে রবারের বলে ক্রিকেট খেলছে। তিনটি গোরু ঘাস খেয়ে চলেছে। একটা টালির চালের ঘর মিড অন বা থার্ডম্যান বাউন্ডারির পেছনে। ঘরের দেওয়ালে ছোট হলুদ বোর্ডে লাল অক্ষরে বাগুইহাটি স্পোর্টিং ক্লাব লেখাটা সে দূর থেকে পড়তে পারল। তার নীচে ছোট অক্ষরগুলো আর পড়া গেল না। ওটাই তা হলে ক্লাবঘর।

সন্দেহ নেই ঠিক মাঠেই সে এসেছে, কিন্তু খেলা হচ্ছে কই? কলাবতী ঘড়িতে দেখল এগারোটা প্রায় বাজে। ফিল্ডার, ব্যাটসম্যান, আম্পায়ার, সাইটস্ক্রিন, স্কোরার—কোথায় কী! ক্লাবঘরের দরজাটা খোলা। ভেতর থেকে গেঞ্জি আর খেটো ধুতি পরা একটি লোক বেরিয়ে এল। পিচের কাছাকাছি এসে পড়া গোরুগুলোকে ভাগাবার জন্য "হেই, হেই, হেট..." বলে চিৎকার করতেই অবিচলিতভাবে উলটো দিকে ঘুরে ওরা আবার ঘাস খেয়ে যেতে লাগল।

কলাবতী এগিয়ে গেল লোকটির দিকে।

"শুনছেন, শুনছেন।"

ডাক শুনে লোকটি তাকাল।

"আজ এই মাঠে বাগুইহাটির সঙ্গে কদমতলা ফ্রেন্ডসের খেলা

ছিল না ?"

"ছিল। হয়নি।" সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে লোকটি ক্লাবঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করল। কলাবতী পিছু নিল।

"হল না কেন ?"

"জানি না।"

"দুটো টিম এসেছিল ?"

"এসেছিল।"

তারা ক্লাবঘরের দরজায় পৌঁছল।

"তা হলে খেলা হল না কেন ? আম্পায়াররা আসেননি ?"

"এসেছিল।" লোকটি ঘরের মধ্যে ঢুকল। কলাবতীও পিছু নিল। "কদমতলার ক্যাপ্টেন বলল খেলব না, আমাদের সেক্রেটারি গুচাবাবুও বলল খেলব না তাই খেলা হল না।"

কলাবতী ঘরের চারদিকে চোখ বোলাল। বেশ লম্বা বড় ঘরটার এককোণে একটা তোলা উনুন, থালা, গ্লাস, হাঁড়ি ইত্যাদি। লোকটি এই ঘরেই থাকে আর রেঁধেবেড়ে খায়। নিশ্চয়ই ক্লাবের মালি। ঘরের মাঝে টেব্‌লটেনিস বোর্ড। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রয়েছে ক্যারম বোর্ড। মেঝেয় বাঁশে জড়িয়ে রাখা প্র্যাকটিস নেট। গোলাচুনের বালতি, ঝাঁটা, বেঞ্চে রাখা দুটো ক্যানভাসের থলির খোলা মুখ থেকে উঁকি দিচ্ছে কয়েকটা ব্যাট আর কয়েক জোড়া প্যাড। দেওয়ালে হেলান দিয়ে দশ-বারোটা স্টিলের ফোল্ডিং চেয়ার।

"অনেকদূর থেকে আসছি দাদা, একটু বসব। এক গ্লাস জল খাওয়াবেন ?" কলাবতী একটা চেয়ার খুলে নিয়ে বসে পড়ল।

মধ্যবয়সী লোকটি কথাবার্তায় অমায়িক এবং ভালমানুষ। যেভাবে কথা বলল, তাতে মনে হয় একটু লেখাপড়া করেছে। ময়দানে মালি বলতে যা বোঝায় সেইরকম নয়। একটি মেয়ে



'দাদা' বলেছে, জল চেয়েছে, এতে যেন তাকে খুশি মনে হল।

একটা স্টিলের জাগ তুলে নিয়ে লোকটি "একটু বসুন, টিউকল থেকে এনে দিচ্ছি" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টেব্‌ল টেনিস বোর্ডের ওপর স্কোরবুকটা পড়ে রয়েছে। কৌতূহলবশতই কলাবতী উঠে গিয়ে তার পাতা ওলটাল। একেবারে শেষ দুটো পাতায় আজকের দুটো দলের খেলার স্কোর লেখা ! বোঁওও করে কলাবতীর মাথার মধ্যে একটা ভীমরুল ঢুকে পড়ল।

তাজ্জব ব্যাপার ! খেলাই হল না অথচ স্কোরবইয়ে ম্যাচের স্কোর আর রেজাল্ট লেখা ! কী করে এটা সম্ভব ? কলাবতী আরও অবাক হল দু'জন আম্পায়ারেরই সই রয়েছে দেখে। চোখ কচলে নিয়ে সে আবার স্কোর বইয়ের পাতা দুটো দেখল। বাগুইহাটির সাতজন প্রথম ব্যাট করে তুলেছে ১৬৩ রান। জবাবে কদমতলার পাঁচজন আউট হয়ে ১৪৩ রান। ম্যাচ ড্র ! দ্রুত সে ঝোলা থেকে খাতা বের করে টুকতে লাগল।

লোকটি জলভরা জাগ নিয়ে ফিরে, একটা প্লাস্টিকের গ্লাসে জল ঢেলে কলাবতীর হাতে দিয়ে বলল, "আপনি কি খেলা দেখতে এসেছেন ?"

"হ্যাঁ। আমার দাদা কদমতলা ফ্রেন্ডসে খেলে। তার খেলা দেখব বলে এলাম আর কিনা খেলাই হল না !" কলাবতীর গলায় আশাভঙ্গের বেদনা ফুটে উঠল। "হল না কেন বলুন তো ?"

"দুটো টিমই তো খেলতে চাইল না। বলল, এ-ম্যাচে জিতলেও যা, হারলেও তাই। গুচাবাবু আম্পায়ার দু'জনকে বলল, ম্যাচটা না খেললে অনেক টাকা খরচা বাঁচবে। দয়া করে আপনারা ম্যানেজ করে দিন। ছেলেরাও খেলতে চাইছে না। কদমতলার ক্যাপ্টেন বলল, স্কোর আমরা বানিয়ে দিচ্ছি, আপনারা

স্কোরে ড্র দেখিয়ে দিন। এখানে সি এ বি-র কেউ নেই, জানাজানিও হবে না।”

“আম্পায়াররা রাজি হলেন ?”

“রাজি তো হচ্ছিল না। তখন এ-পাড়ারই একটা ছেলে মানিক, নামকরা মস্তান, ছুরি বের করে একজন আম্পায়ারকে বলল, আপনার মেয়ে-জামাই বাগুইহাটিতে থাকে না ? ব্যস, ওতেই কাজ হয়ে গেল। ভালই করেছে, যা দিনকাল ! অন্যজনও বলল, ছুরি মারলে কি সি এ বি রক্ষে করতে আসবে ? আপনি সই করে দিন, আমিও করে দিচ্ছি। তখন দু'জনেই সই করে দিল। আপনার দাদা কি আপনাকে বলেনি খেলা হবে না ?”

কলাবতী মাথা নাড়ল। একটা দারুণ খবর পেয়ে যাওয়ার উত্তেজনায়, যদিও তার ঝোলায় জলের বোতল রয়েছে, তবুও সে আর-এক গ্লাস জল চাইল। যে-ম্যাচে একটা বলও খেলা হল না সেই ম্যাচের স্কোর আম্পায়াররা সি এ বি-তে দেবে। কালকের কাগজে-কাগজে এই খেলার রেজাল্টও বেরোবে ! এমন কাণ্ড পৃথিবীর কোথাও ঘটেছে কি ? আর একজনও খবরের কাগজের লোক আসেনি। এমন অসাধারণ একটা খবর শুধুমাত্র সে জোগাড় করেছে। একেই বোধ হয় 'স্কুপ' বলে। কাল বঙ্গবাণী পড়ে সবার চোখ চড়কগাছ হয়ে যাবে। সি এস জে সি টেন্টে নিশ্চয় বলাবলি হবে, দু'দিন মাঠ করেই একটা মেয়ে কিনা এমন একটা খবর বের করে ফেলল ! কলাবতী শিহরিত হল আনন্দে। দু'দিনেই সে সবার নজরে পড়ে যাবে।

লোকটির হাত থেকে যখন সে জলের গ্লাস নিচ্ছে তখনই ব্যস্তভাবে একটি লোক ঘরে ঢুকল। মাঝবয়সী, রোগা, লম্বা, মুখে উদ্বেগ। কলাবতীকে দেখে ভ্রূজোড়া কোঁচকাল।

“শ্যামাপদ, স্কোরবইটা দে।”



শ্যামাপদ তটস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি স্কোরবইটা তুলে নিয়ে নবাগতর হাতে দিল। সে স্কোরবইটা খুলে খুব মন দিয়ে উপর-নীচ চোখ বুলিয়ে বিড়বিড় করল, “যা ভেবেছি, যোগে ভুল করেছে। আবার এখন দৌড়োও।” তারপর সে কলাবতীর দিকে প্রায় কটমট করে তাকিয়ে রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করল, “আপনি কে ? এখানে, এখন ?”

“আমি বঙ্গবাণীর রিপোর্টার, আমার নাম কলাবতী সিংহ। নতুন, তাই আগে আমায় দেখেননি। আপনি ?” শুকনো, কঠিন স্বরে উত্তর দেওয়া লোকটি কেমন যেন মিইয়ে গেল। কলাবতী ইতিমধ্যে বুঝে গেছে জোচ্চুরি যারা করে তারা অমেরুদণ্ডী শ্রেণীতে পড়ে। এদের সঙ্গে ডেঁটে কথা বলতে হয়।

“আমি ক্লাবের সেক্রেটারি শ্রীশ মিত্তির।”

“ইনিই গুচাবাবু।” শ্যামাপদ যোগ করল।

“আপনি এখানে এসেছেন কেন ?” গুচাবাবু ঈষৎ অবাক হয়ে প্রশ্নটা করল।

“কেন আবার, ম্যাচটা রিপোর্ট করব বলে।”

“কিন্তু খেলা তো হয়নি।” বিনীতকণ্ঠে সেক্রেটারি জানালেন।

“হয়নি বুঝি ? তা হলে সেটাই রিপোর্টে লিখব। কিন্তু কেন হয়নি ?”

“কদমতলার প্রেসিডেন্ট আজ সকালে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন, তাই ওরা খেলবে না বলল। শোক আর সম্মান জানাতে আমরাও এক মিনিট নীরবতা পালন করে খেলা বাতিল করতে রাজি হয়ে গেলাম, এই আর কি !”

“তা হলে এটাই লিখব, বাগুইহাটির সেক্রেটারি শ্রীশ মিত্র জানালেন, কদমতলার প্রেসিডেন্ট হঠাৎ হার্ট... ।”

“না, না, না, আমি ঠিক নিশ্চিত নই এ-ব্যাপারে। এসব

www.boiRboi.blogspot.com

আপনি লিখতে যাবেন না।" গুচাবাবু আঁতকে উঠল।

"নিশ্চিত না হয়েই আপনারা এক মিনিট নীরবতা পালন করে ফেললেন?" বয়স্ক একটা লোকের মিথ্যা কথা বলা দেখে কলাবতীর যেমন মজা লাগছে তেমনই দুঃখও হল। নিজেদের এরা কত নীচে নামাতে পারে, বয়সকেও মর্যাদা দেয় না।

"দেখুন, ব্যাপারটা আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না। আপনার বয়স কম, মাঠের হালচাল সম্পর্কেও অনভিজ্ঞ। এসব একটু-আধটু হয়েই থাকে। না হলে ক্লাব চালানো যায় না।" গুচাবাবুর কথায় ও ভাবভঙ্গিতে আত্মসমর্পণের মতো দীনতা ফুটে উঠল।

"একটু-আধটু কী হয়ে থাকে?" কলাবতী নাছোড়বান্দার মতো কোণঠাসা করতে চাইল গুচাবাবুকে।

"একটু-আধটু ম্যানিপুলেট, একটু-আধটু ম্যানেজ না করলে আমাদের মতো গরিব ক্লাবের টিকে থাকা যায় না। আজকের ম্যাচটা যে খেলা হল না, এতে কারুর কোনও ক্ষতি হয়নি। না বেঙ্গল ক্রিকেটের, না ক্রিকেটারদের, না সি এ বি লিগের, না এই দুটো ক্লাবের। কারুরই পাকা ধানে মই পড়ল না। বাগুইহাটি-কদমতলা অলরেডি নক আউটে উঠে গেছে, এটা ছিল গ্রুপের শেষ লিগ ম্যাচ। পয়েন্ট ভাগাভাগিতে কারুরই কোনও বাড়তি সুবিধে হল না, তা হলে অন্যায়টা কোথায়? বরং একটা ম্যাচ খেলানোর খরচা থেকে, অযথা রোদ্দুরে ছুটোছুটি করার থেকে বাড়িতে গিয়ে ঘুমনো কি সিনেমা দেখা অনেক কাজের!" বলতে-বলতে শ্রীশ মিত্তিরের গলা অন্তরঙ্গ হয়ে এল। একটা বাচ্চা অবুঝ মেয়েকে সে যেন বোঝাবার চেষ্টা করল কেন এই নোংরামিতে তারা নামে।

কলাবতী চেয়ার থেকে উঠে পড়ল গম্ভীর মুখে। গুচাবাবুকে



যেন বিপন্ন-বিপন্ন মনে হল। মুখে অনিশ্চিত ভয়।

"আপনি কি লিখবেন নাকি? প্লিজ লিখবেন না, জানাজানি হলে দুটো ক্লাবই বিপদে পড়ে যাবে, সাসপেন্ড হবে। প্লেয়াররা, আম্পায়াররা শাস্তি পাবে।" গুচাবাবু হাতজোড় করে ফেলল।

"মাফ করবেন। আমার কাজ আমাকে করতেই হবে।" ঘর থেকে বেরোবার জন্য সে পা বাড়াল।

"তা হলে কিন্তু আমরাও ভাবব কী করা যায়।" গুচাবাবু খোলাখুলিই জানিয়ে দিল পেছন থেকে।

"ভাবুন।" কলাবতী হনহনিয়ে এগিয়ে গেল।

রাস্তায় আসামাত্রই সে খালি একটা রিকশা পেয়ে গেল। বাগুইহাটি মোড়ে যাওয়ার জন্য তিন টাকা চাইল রিকশাওয়ালা। একটাকা ভাড়া কমে যাওয়াকে সে ভাল লক্ষণ বলে ধরে নিল। কলাবতী রিকশায় উঠে বসল। আসার সময় ভাঙাচোরা গর্ত ভরা রাস্তা তাকে যে কষ্ট দিয়েছিল, ফেরার সময় সে কিছুই অনুভব করল না। একটা নতুন আনন্দে সে মশগুল। সাংবাদিকরা যে সাফল্য চায় সেটা যে এত তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবে, এটা ভাবতেই মাথার মধ্যে ঢুকে যাওয়া ভীমরুলটা আবার উড়তে লাগল। সে ঠিক করল এখনই বঙ্গবাণীতে গিয়ে লেখাটা লিখতে বসবে। ভেবেচিন্তে দারুণভাবে এটা তাকে লিখতে হবে।

বঙ্গবাণীর খেলার টেব্‌লে তখন বলদেব। পাঁচজনের মধ্যে ওরই বয়স কম। খেলার বই, ম্যাগাজিন পড়ে। কিঞ্চিৎ বিলাসী এবং কাজে ফাঁকি দেওয়ার কোনও সুযোগই নষ্ট করে না। বলদেবের সামনে খোলা রয়েছে একটা সিনেমার ইংরেজি পত্রিকা এবং পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছ' ফুটেরও বেশি লম্বা একটি লোক।

লোকটি খুবই রুগ্‌ণ, জিরজিরেই বলা যায়। গাল বসে যাওয়া লম্বাটে মুখে কপালটা ছোট, ভ্রূদুটি ঘন এবং চোখজোড়া কোটরে

ঢোকা। মাথায় প্রচুর চুল, যা অযত্নে সত্যিই পাখির বাসার মতো, দাড়ি কয়েকদিন কামানো হয়নি। লোকটির দাড়ি এবং চুল কাঁচাপাকা, তবে সাদার ভাবটাই বেশি। ওর পরনে ফিকে খয়েরি রঙের খদ্দরের টিলেহাতা পাঞ্জাবিটা চওড়া কাঁধে যেন হ্যাঙ্গারে ঝোলানো মনে হয়। সেটা পরিষ্কার না ময়লা বোঝা শক্ত, তবে ইস্ত্রি করা নয়। ধুতিটা আধময়লা। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। গোড়ালির চামড়া ফাটা এবং তার মধ্যে ময়লা জমে আছে। বয়স মনে হয় সত্তরের কাছাকাছি।

লোকটি ঝুঁকে বলদেবকে কিছু একটা বলছে তখন কলাবতী টেবলে ওদের উলটোদিকে বসল। তাকে দেখে বলদেব একটু অবাক হয়ে বলল, "তুমি এখন ?"

"খেলা হয়নি তাই চলে এলাম।"

"কেন, পিচ খুঁড়ে রেখেছে ?" তারপর বলল, "কাদের খেলা ছিল ?"

"বাগুইহাটি-কদমতলা।" কলাবতী এইটুকু বলেই ঝোলার মধ্য থেকে স্যান্ডুইচ বের করায় মন দিল।

"হ্যাঁ, কী বলছিলেন যেন ?" বলদেব পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে বলল।

"গত বুধবার আপনাদের কাগজে একটা লেখা বেরিয়েছে, বরুণ বসুরায়ের সঙ্গে ইন্টারভিউ।"

কলাবতী চোখ তুলে লোকটির দিকে তাকাল। শঙ্কর দত্ত নামে বাইরের একজন, যে বলদেবেরই বন্ধুর ভাই, ইন্টারভিউ নিয়েছে। অনেকদিন আগের লেখা, কম্পোজ হয়ে পড়ে ছিল। দুটো স্যান্ডুইচের একটা বলদেবের দিকে বাড়িয়ে কলাবতী বলল, "বলদেবদা খাবেন ?"

"নাহ্, ভাত খেয়ে আর এখন পাঁউরুটি চিবোতে পারব না।



মিষ্টিফিস্টি থাকে তো দাও।"

"নেই। কলা দিতে পারি।"

"দাও।"

কলাটা হাতে নিয়ে সন্তর্পণে খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে বলদেব বলল, "হ্যাঁ ইন্টারভিউ, তা কী হয়েছে ?"

"উনি বলেছেন ফর্টিএইট ওলিম্পিকের জন্য লখনউয়ে যে সিলেকশন ট্রায়াল হয়, তাতে হপস্টেপ অ্যান্ড জাম্পে সাড়ে আটচল্লিশ ফুট নাকি লাফিয়েছিলেন। এটা ভুল কথা।" বিনীত, মৃদু গলায় লোকটি এমনভাবে বলল যে, বলদেব কলায় কামড় দিতে গিয়ে থেমে গেল।

"আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।" কলাবতী বলল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ বসুন।" বলদেব কথাটা বলে কলার আধখানা মুখে পুরল। "ভুল কথা কেন ?"

লোকটি চেয়ারে বসল। একটু কুণ্ঠিত ভাবেই, ইতস্তত করে বলল, "বরুণ অতটা লাফায়নি।"

"সেটা আপনি জানলেন কী করে ? আটচল্লিশ সালে আপনি কি তখন লখনউয়ে ছিলেন ?" বলদেব ঝাঁঝালো গলায় বলল।

"ছিলুম।"

শান্ত, নিচু গলায় লোকটি বলল। কলাবতী ও বলদেবের দৃষ্টি একই সঙ্গে প্রখর হয়ে উঠল।

"কী জন্য ছিলেন ?" বলদেব প্রশ্নটা করে নড়েচড়ে বসল।

"কম্পিটিটার ছিলুম। আমি, বরুণ আর বোম্বাইয়ের হেনরি রেবেলো হপস্টেপের ট্রায়ালে ছিলুম।"

"আপনার নাম ?" কলাবতী জিজ্ঞেস করল।

"পরিমল বেরা।... সাড়ে আটচল্লিশ ফুট লাফিয়েছিল রেবেলো। তখন ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ছিল জাপানের তাজিমার, সাড়ে

বাহান্ন ফুট, বার্লিন ওলিম্পিকে করা।"

"আপনি বলতে চান বরুণ বসুরায় সাড়ে আটচল্লিশ ফুট লাফাননি? মিথ্যে কথা বলেছেন?" বলদেব সতর্কভাবে ধীরে-ধীরে কথাটা বলল উকিলের জেরা করার ভঙ্গিতে।

"না, লাফায়নি। আমি আর বরুণ দু'জনেই সাড়ে চুয়াল্লিশ করেছিলুম। তাই দূরত্বটা আমার ভালই মনে আছে। রেবেলোর ধারেকাছে আমরা তিনটে জাম্প করেও যেতে পারিনি।" অত্যন্ত দৃঢ় এবং তৃপ্তস্বরে পরিমল কথাগুলো বলল। "অসাধারণ পারফরমান্স!"

"বরুণ বসুরায় একটা অডিট ফার্মের মালিক, মানী লোক। তাঁকে মিথ্যেবাদী বলতে হলে প্রমাণ দাখিল করতে হবে।... আপনি কী করেন?" বলদেব তাচ্ছিল্যভরে কথা বলে লোকটির আপাদমস্তক চোখ বোলাল।

পরিমল এই প্রথম যেন কুঁকড়ে গেল। একটু দ্বিধাভরে বলল, "আমি বিশেষ কিছু করি না, সামান্য একটা ব্যবসা।"

"কিসের ব্যবসা?"

"ছবির ফ্রেমের ব্যবসা।"

"তার মানে ছবি-বাঁধাইয়ের?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় ব্যবসাটা?"

"আমি যেখানে থাকি, তার কাছেই।"

"কোথায় থাকেন?"

"চুয়াল্লিশের এফ অবিনাশ কবিরাজ লেন, বাগমারিতে।"

কলাবতীদের বাড়ি থেকে বাগমারি বেশি দূরে নয়, বড়দিদের বাড়ি তো ওখানেই, আর অবিনাশ কবিরাজ লেনে থাকে তাদের ক্লাসেরই সুচরিতা। এই বৃদ্ধ তার এলাকারই লোক, কলাবতী



ব্যাপারটায় তাই কৌতূহলী হয়ে উঠল।

"লাফিয়েছিলেন সাড়ে চুয়াল্লিশ আর থাকেন চুয়াল্লিশ নম্বরে, অদ্ভুত যোগাযোগ তো!" কলাবতী হালকা স্বরে বলল। পরিমল হাসল। নীচের পাটির সামনের দুটো দাঁত নেই।

"তা এখন কী করতে হবে?" বলদেব ভ্রূ তুলে জানতে চাইল, "প্রতিবাদ ছাপাতে হবে?"

"না, না, না, এমন কিছু বিরাট ব্যাপার এটা নয় যে, চিঠি ছাপতে হবে। আমি কতটা লাফিয়েছিলুম তা জেনে এখন কার কী লাভ! আর জানলেও তাতে আমার এক ছটাকও সম্মান বাড়বে না।"

"কেন, ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি তারা তো গর্ববোধ করতে পারবে এই বলে যে..." কলাবতী থেমে গেল পরিমলের মুখে ছড়ানো হাসিটা দেখে।

"আমি বিয়েথা করিনি, সংসারেও কেউ নেই।"

"অ, সম্মানটম্মানের দরকার নেই, ভাল কথা। তা হলে কী চান?"

"রেবেলোর সম্মান।"

"কী বললেন!" বলদেব সিধে হয়ে বসল। এতক্ষণ তার যে গড়িমসি ভাবটা ছিল সেটা পরিমলের দুটি শব্দেই খসে পড়ল।

"আসল সাড়ে আটচল্লিশ যে লাফিয়েছিল, তাকে তার প্রাপ্য সম্মানটা দেওয়া হোক, এটাই চাই।"

"বলছেন কী আপনি? চল্লিশ বছরেরও আগে কে একজন একটা লাফ মেরেছিল... বেশ ভাল কথা, সাড়ে আটচল্লিশের কোনও প্রমাণ আছে কি?"

"বরুণ বসুরায়ও কি প্রমাণ দিয়েছে?"

বলদেব মনে-মনে যে বিব্রত হচ্ছে কলাবতী ওর মুখ দেখেই



www.boiRboi.blogspot.com

সেটা বুঝে গেল।

"যে লিখেছে সে প্রমাণ দেখেই লিখেছে। বরুণ বসুরায় তাকে পেপার কাটিং দেখিয়েছেন।"

"কোন কাগজের কাটিং?" পরিমল বেরা অবাক হয়ে জানতে চাইল। "আমার কাছেও কাটিং আছে। ট্রায়ালের পরের দিন লখনৌ হেরাল্ড-এ আমাদের লাফের ডিসট্যান্স দিয়ে রেজাল্ট বেরিয়েছিল। আমি কেটে রেখেছি।"

"আপনার কাছে কাটিং আছে?" বলদেব নিশ্চিত হওয়ার জন্য জোর দিয়ে বলল।

"আমি এনে দেখাতে পারি।" পরিমল জোর দিয়ে বলল।

"বেশ, দেখাবেন এনে।" কথাটা বলে বলদেব সিনেমা ম্যাগাজিনটায় ঝুঁকে পড়ল।

পরিমল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে "আচ্ছা আসি, নমস্কার" বলে চলে যাচ্ছে, তখন কলাবতী পেছন থেকে তাকে ডাকল।

"পরিমলবাবু, শুনুন।"

পরিমল বেরা ঘুরে দাঁড়াল এবং এগিয়ে এল।

"ধরা গেল রেবেলো সাড়ে আটচল্লিশ ফুটই লাফিয়েছিল, কিন্তু সেটা না বললে এত বছর পর কী এসে যায়? আপনারই বা এই নিয়ে এত দুশ্চিন্তা কেন? ওটা তো আর ওয়ার্ল্ড রেকর্ড নয়!" কলাবতী শান্তভাবেই খোঁজ করতে চাইল পরিমলের 'দুশ্চিন্তা'র।

"কিন্তু তখনকার ওয়ার্ল্ড ক্লাস জাম্প ওটা। রেবেলো ওলিম্পিক ফাইনালে উঠেছিল, গোল্ডও পেতে পারত।" পরিমলের গলায় উচ্ছ্বাস আর তারিফ এসে গেল।

বলদেব ম্যাগাজিন থেকে চোখ তুলে বলল, "ওলিম্পিকের কথা হচ্ছে না। প্রশ্নটা হল, আপনার কী এমন মাথাব্যথা হল যে, রেবেলোর হয়ে ওকালতি করতে এসেছেন?"



"করব না?" পরিমলের কোটরে-ঢোকা চোখজোড়া হঠাৎই দপ করে জ্বলে উঠল। গলায় ফুটে উঠল ব্যগ্রতা। "একজনের কৃতিত্ব অন্য লোক নিয়ে নেবে! কত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একজন অ্যাথলিট জীবন শুরু করে। দিনের পর দিন ঘাম ঝরিয়ে, সাধ-আহ্লাদ বর্জন করে, ডিসিপ্লিন্ড থেকে সে একটু-একটু করে এগোয়। তার এগনো মানে দেশেরও এগনো। এজন্য তো তাকে মর্যাদা, শ্রদ্ধা দেওয়া উচিত। চুরি করে একজন সেটা নিয়ে নেবে আর তাতে আপনারা সাহায্য করবেন?" পরিমলের এই প্রথম গলার স্বর উঠল, তাকে বিচলিত দেখাচ্ছে। চেয়ারের পিঠ ধরে থাকা মুঠি-জোড়ার শিরা ফুলে উঠেছে।

সে আবার বলল, "রেবেলো আপনাদের কাগজ পড়বে না, নিশ্চয় বাংলা জানে না। এখন সে কোথায় আছে তাও আমি জানি না। কিন্তু আমি তো আছি, আমি তো জানি। এক অ্যাথলিটের মর্যাদা অন্য অ্যাথলিট রক্ষা করবে, এটাই তো কর্তব্য।"

বলদেব চোখ নামিয়ে নিল। মৃদুস্বরে বলল, "কাল-পরশুই তা হলে স্পোর্টস এডিটরের কাছে নিয়ে আসুন আপনার কাটিংটা। সত্যি হলে ভুলটা নিশ্চয় সংশোধন করা হবে।"

"হ্যাঁ, এনে দেখাব, নমস্কার।"

পরিমল চলে যাওয়ার পর কলাবতী বলল, "অদ্ভুত লোক, না?

"মাথায় ছিট আছে।"

"থাকতে পারে, তবে ছিটেল লোকেরাই কিন্তু আমাদের নাড়া দেয়। একজন অ্যাথলিটের মর্যাদা অন্যজন রক্ষা করবে, এমন কথা জীবনে কখনও শুনিনি, আপনি শুনেছেন?"

বলদেব কিছুক্ষণ সময় নিয়ে ধীরে-ধীরে মাথা নাড়ল। "দেখি কী কাটিং আনে।"

"অত জোর দিয়ে বলল যখন, নিশ্চয় আনবে।" কলাবতী প্যাডের কাগজে হাত মুছে, বোতল থেকে জল খেল। দেওয়াল-ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে, খাতাটা খুলে প্যাডটা টেনে নিল।

এখন সে বাগুইহাটি-কদমতলা ম্যাচটা সম্পর্কে লিখবে। শ্যামাপদ আর গুচাবাবুর সঙ্গে তার যা কথাবার্তা হয়েছে সেগুলো মনে করার জন্য সে কয়েক মিনিট মাথা নামিয়ে চোখ বন্ধ করল। মাথার মধ্যে একটা টেপ রেকর্ডারের চলা যেন শুরু হল। দু'জনের প্রতিটি কথা সে শুনতে পাচ্ছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে মাঠটাকে। গোরু চরছে, দড়ি দিয়ে ঘেরা পিচ, একধারে রবারের বলে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে, মাঠের পাশের বাড়িগুলো, দু'ধারের রাস্তা, কিন্তু দু'জন আম্পায়ার আর শাদা ট্রাউজার্স ও শার্টপরা তেরোটা মানুষকে সে খুঁজে পাচ্ছে না।

কলাবতী ঠিক করল, এইখান থেকেই সে লেখাটা শুরু করবে।

তিন পাতা লিখে ফেলে প্যাডের নতুন পাতার ওপরের কোণে চার সংখ্যাটা সবে লিখেছে, তখন সম্পাদকের বেয়ারা এসে কলাবতীকে বলল, "আপনাকে ডাকছেন।"

কলাবতী প্রায় চমকে উঠল। "কে ডাকছেন!"

"এডিটর।"

বেয়ারা চলে গেল। বলদেব বার্তা বিভাগে গিয়ে গল্প জুড়েছে। কলাবতী তার লেখা তিনটি পাতা ঝোলার মধ্যে ভরে, ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে, সম্পাদকের ঘরে এল দুরু-দুরু বক্ষে।

মধ্যিখানে সিঁথি-কাটা চুলে সদানন্দ দু'হাতের তেলো আলতো করে বুলোচ্ছিলেন। চশমাটা টেব্‌লে। সেটা তুলে চোখে দিয়ে

একগাল হেসে বললেন, "বোসো বোসো। তারপর কাজকম্ম কেমন চলছে? ভাল লাগছে? ভব বলছিল, তুমি তো বাংলা ভালই লেখো, পরিশ্রমও করতে পারো। এরকমই তো চাই। না ঘুরলে, না খাটলে শুধু টেলিফোন করে-করে খবর জোগাড় করলে জার্নালিস্ট হওয়া যায় না। ঘোরো, হাঁটো...বসে থেকো না, ঘুরে-ঘুরে খবর খুঁজে বেড়াও। আজকে কি বেরিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ। বাগুইহাটি গেছলুম।" সদানন্দর কথা তাকে উৎসাহিত করেছে। সে উত্তেজিত স্বরে দ্রুত বলে গেল। "জানেন, কী দারুণ একটা খবর আজ পেলুম! ম্যাচ খেলাই হয়নি, অথচ খেলা হয়েছে বলে স্কোরবইয়ে ভুয়ো রান, উইকেট, টোটাল, এমনকী ম্যাচটা ড্র বলে লেখাও হয়ে গেল আর তাতে দু'জন আম্পায়ার সইও করে দিয়েছেন। ভাবতে পারেন, এটা লিগের খেলা! খেলার মাঠে এর চেয়ে ঘৃণ্য আর কিছু কী হতে পারে? আর কোনও কাগজের লোক ভাগ্যিস যায়নি। আমি একাই খবরটা পেয়ে গেছি।"

কলাবতী জ্বলজ্বল চোখে সম্পাদকের দিকে তাকাল। টানা কথাগুলো বলে সে হাঁফিয়ে পড়েছে। সে আশা করছে সম্পাদকও ওইভাবে চেয়ারে হেলান দিয়ে রিভলভিং চেয়ারটাকে ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরানো বন্ধ করে খাড়া হয়ে বসবেন। কিন্তু সদানন্দ ঘোষ তা করলেন না।

"এটা তো একটা দুর্নীতির ব্যাপার।" সদানন্দ অনুত্তেজিত গলায় বললেন।

"নিশ্চয়। জালিয়াতি, চিটিং।" কলাবতী আরও উত্তেজিত।

"সিরিয়াস, খুবই সিরিয়াস অভিযোগ তুমি করতে যাচ্ছ দুটো ক্লাব আর আম্পায়ারদের বিরুদ্ধে। কীভাবে তা হলে লিখবে?"

"এই দেখুন না, লেখাটা প্রায় হয়েই গেছে।" কলাবতী ব্যস্ত



হয়ে ঝুলি থেকে তিনটি পাতা বের করে এগিয়ে দিল।

তিন পাতা লেখা পড়ার পর ঈষৎ চিন্তিত মুখে সদানন্দ বললেন, "তুমি যা-যা লিখেছ, কোর্টে যদি ওরা যায় তা হলে প্রমাণ দাখিল করতে পারবে?"

"নিশ্চয়। স্কোরশিটটাই প্রমাণ। তা ছাড়া শ্যামাপদ, শ্রীশ, দু'জন আম্পায়ার—।"

সদানন্দর মাথা নাড়া দেখে কলাবতী থেমে গেল। "ওরা নিজেদের বাঁচাবার জন্য বলবে কোনও স্কোরশিটই তৈরি হয়নি, সেরকম কিছু সি এ বি-তে জমাও পড়েনি। সুতরাং বঙ্গবাণী মিথ্যে কথা লিখেছে। এর পর ওরা ক্ষতিপূরণ চেয়ে মানহানির মামলা করবে।"

"তা কী করে হয়! আমি নিজের চোখে স্কোরবুকে যা দেখলুম সেটা ভুল?"

"হ্যাঁ, ভুল। এইমাত্র বাগুইহাটির প্রেসিডেন্ট, আমারই সম্পর্কিত ভাগ্নে টেলিফোনে পুরো ব্যাপারটাই জানিয়ে বলল, স্কোরবই থেকে দুটো পাতা ওরা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে আর আম্পায়াররা সি এ বি-কে রিপোর্ট করেছে, রাত্রে কারা পিচ খুঁড়ে দেওয়ায় ম্যাচটা খেলানো যায়নি। সুতরাং ভুয়ো স্কোরশিট বানানো হয়েছে বলে যদি কালকের বঙ্গবাণীতে খবর বেরোয় তা হলে আপনারা বিপদে পড়ে যাবেন।" সদানন্দর মুখে বিষণ্ণ একটা হাসি, চোখেও দুঃখের ছায়া। তিনি বিশ্বাস করেন কলাবতী যা দেখেছে এবং লিখেছে তার শতকরা একশো ভাগই সত্যি। কিন্তু তিনি নিরুপায়। নাতনির বয়সী মেয়েটির মনের অবস্থাটা তিনি বুঝতে পারছেন। প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে, টগবগিয়ে একটা কিছু করে দেখাবার ইচ্ছেটা যে কীভাবে মিইয়ে আসে, সেটা এখন তিনি চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন।

বিধ্বস্ত কলাবতী মাথা নামিয়ে বসে রয়েছে। সে বুঝে গেছে তার লেখাটা আর ছাপা হবে না। একটা ফাঁপানো বেলুন ছাড়া তার বুকের মধ্যে আর কিছু যেন এখন নেই। মাথা নাড়ল সে। সাংবাদিক হওয়ার শখ ঘুচে গেছে। আজই শেষ। খেলার মাঠ বড় নোংরা লাগছে তার, দমবন্ধ হয়ে আসছে।

"তুমি বরং ডেস্‌কে বসেই কাজ করো।"

কলাবতী চেয়ার থেকে উঠে অস্ফুটে বলল, "দেখি।"

পায়ে-পায়ে সম্পাদকের ঘর থেকে সে বেরিয়ে এল। পরেশ এসে গেছে। কলাবতীকে দেখেই একগাল হেসে বলল, "মাঠ থেকে ফিরলে?"

"হ্যাঁ। বাগুইহাটি-কদমতলা ম্যাচ ছিল।"

"রেজাল্ট কী?"

"ড্র।"

পরেশ ছোট্ট একটা পেয়ারা বাড়িয়ে ধরল। "নাও, আমার গাছের। তোমার জন্যই এনেছি।"

পেয়ারাটা হাতে নিয়ে তার চোখে প্রায় জল এসে গেল। সামান্য ফল কিন্তু অসামান্য আন্তরিকতা। এটাই সে এখন চাইছে।

"স্কুল খুলে যাচ্ছে পরেশদা। এখন আর রোজ আসতে পারব না।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, সবার আগে লেখাপড়া।"

কলাবতী বাড়ি ফিরল একটু দেরি করে। ইচ্ছে করেই বঙ্গবাণী অফিস থেকে সে বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে এসেছে অস্থির মনকে শান্ত করার জন্য। হাঁটতে-হাঁটতে একটা ব্যাপার সে ঠিক করে ফেলেছে, মাঠের লোকেদের কাছে হেরে যাওয়া মানেই পৃথিবীর লয় নয়। সে মোটেই দুঃখে ভেঙে পড়বে না। জীবনে যা



আসবে সেটা হাসিমুখে সহজভাবে নেবে।

যখন সে ফটক ছাড়িয়ে বাড়িতে ঢুকল, তখন তার মনে কোনও খেদ, কোনও বিদ্বেষ বা কষ্ট আর নেই। দাদু আর কাকাকে সে জানিয়ে দিল, খেলার রিপোর্টার হওয়ার ইচ্ছেটা আপাতত সে মুলতুবি রাখছে। বুদ্ধিটা আর-একটু পরিপক্ক না হলে মাঠের লোকেদের সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না।

"তবে আজ একটা অদ্ভুত লোককে দেখলুম, যে নিজে এককালে ট্রিপ্‌ল জাম্পার ছিল।"

"আগে যাকে বলা হত হপ স্টেপ অ্যান্ড জাম্প?" এই বলে সত্যশেখর জানিয়ে দিলেন অ্যাথলেটিক্‌সের খবরটবর তিনি রাখেন।

"হ্যাঁ, আগে তাই বলা হত। এই লোকটির নাম পরিমল বেরা।"

"পরিমল বেরা?" রাজশেখর ঔৎসুক্য দেখালেন। "ভাল অ্যাথলিট ছিল। আমাদের বরুণের সঙ্গে ওর খুব কম্পিটিশন হত।"

"আমাদের বরুণ মানে!" কলাবতী অবাক হয়ে গেল। "বরুণ বসুরায়?"

"হ্যাঁ রে, গোবিমাসিমার দেওর বরু! আমার থেকে বয়সে কিছু ছোট। খুব চালিয়াতি কথাবার্তা বলত। আমাকে বলেছিল লন্ডন ওলিম্পিকে যাওয়ার জন্য সিলেক্ট হয়েছিল, কিন্তু গোড়ালিতে চোট লাগে ফাইনাল জাম্পটা দেওয়ার সময়, তাই ও নিজেই নাম উইথড্র করে নিয়ে ওলিম্পিকে যায়নি।"

"উইথড্র না কচু। ট্রায়ালেই কোয়ালিফাই করতে পারেনি। লখনউয়ে সেই ট্রায়ালে পরিমল বেরাও নেমেছিল। বরুণ বসুরায়ের একটা ইন্টারভিউ কিছুদিন আগে বঙ্গবাণীতে

বেরিয়েছে। তাতে বলেছে, সাড়ে আটচল্লিশ ফুট নাকি ট্রায়ালে লাফিয়েছিল। পরিমল বেরা আজ বঙ্গবাণীতে এসে বলল, ওটা হেনরি রেবেলো লাফিয়েছিল। তখনকার ওয়ার্ল্ড ক্লাস জাম্প। সে আর বরুণ লাফিয়েছিল রেবেলোর থেকে চার ফুট কম, সাড়ে চুয়াল্লিশ। তখনকার পেপার কাটিং ওর কাছে আছে, এনে দেখাবে।"

"বরুণের স্বভাবটা দেখছি বুড়ো বয়সেও পালটায়নি। ভাবল এত বছর পর কে আর ধরতে পারবে, তাই গুলটা মেরে দিল।" রাজশেখর মিটমিট করে হাসলেন।

সত্যশেখর বললেন, "এর একটা প্রতিবাদ ছাপিয়ে দিক পরিমল বেরা।"

"বললেই কি বঙ্গবাণী ছাপাবে?" কলাবতী প্রায় বলদেবের ভঙ্গি নকল করল। "প্রমাণ চাই না?"

"কারেক্ট। সতু যে ব্যারিস্টারি করে কীভাবে, বুঝতে পারি না। প্রমাণ ছাড়া কোনও প্রতিবাদ গ্রাহ্য হয়?" রাজশেখরকে খুবই ক্ষুব্ধ দেখাল।

মাথাটা চুলকে আড়চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে সত্যশেখর বললেন, "বরুণ বসুরায়ও কি প্রমাণ দেখিয়ে দাবি করেছে সাড়ে আটচল্লিশ লাফিয়েছিল?"

"নিশ্চয় প্রমাণ দিয়েছে। আচ্ছা, আমি এখনই ওকে ফোন করে জেনে নিচ্ছি।" রাজশেখর মার্চ করার ভঙ্গিতে ফোনের কাছে গেলেন। তিন মিনিট খোঁজাখুঁজি করে ডাইরেক্টরি থেকে নম্বরটা বের করে ডায়াল করলেন।

অতঃপর রাজশেখরের তরফে সংলাপটা এইরকম হল :

"হ্যালো, এটা কি বরুণ বসুরায় মশাইয়ের বাড়ি?... হ্যাঁ ওকেই চাইছি... আরে বরু, কী সব আজেবাজে কথা ইন্টারভিউয়ে



বলেছিস? আমি রাজুদা কথা বলছি... দুম করে বলে দিলি লখনউয়ে সাড়ে আটচল্লিশ ফুট ট্রায়ালে লাফিয়েছিস.. গোবিমাসি বাতের কথা বলেছিলেন, আমি তো কোবরেজ দেখাতে বলেছি, দেখিয়েছেন কি?... কী বলছিস? সাড়ে আটচল্লিশই। তা হলে পরিমল বেরা যে বলছে ও আর তুই দু'জনেই সাড়ে চুয়াল্লিশ...হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর কাছে তখনকার পেপার কাটিং আছে। বঙ্গবাণীতে গিয়ে দেখিয়ে এসেছে... ট্রায়ালে নয়? কী বললি, প্র্যাকটিসে সাড়ে আটচল্লিশ করেছিস? সেটা তা হলে বলিসনি কেন? বুঝতে না পেরে ভুল করে লিখে দিয়েছে বললেই হল? ..পরিমল ধরাধরি করে লখনউ ট্রায়ালে গেছল, ওর ট্রেন ভাড়া কি ওর রানিং শ্যুটা তোরই দেওয়া, এসব কথা এখন অবান্তর। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না রে, গন্ধ বেরোবেই। রেবেলোর ডিসট্যান্সকে নিজের বলে চালিয়ে দেওয়াটা খুবই অন্যায়। না না বরু, এই বয়সে এটা ভাল কাজ করিসনি। তুই নিজেই ভুল স্বীকার করে কাগজে একটা চিঠি দে।...কেউ প্রতিবাদ করলে তবেই দিবি? আচ্ছা, তাই দিস। আর শোন, গোবিমাসিকে কোবরেজ দেখাতে বলবি। রাখছি তা হলে।"

ফোন রেখে একগাল হেসে রাজশেখর বললেন, "আমার গুলটা কেমন হল কালু। যেই বলেছি, পরিমল বঙ্গবাণীতে গিয়ে কাটিং দেখিয়ে এসেছে, অমনই বাছাধন স্বীকার করল ট্রায়ালে করিনি, প্র্যাকটিসে করেছি। ব্যাপারটা কী জানিস কালু, আমি তো সত্তর পেরিয়ে গেছি, এখন কোনও বুড়োকে জেনেশুনে মিথ্যা কথা বলতে দেখলে লজ্জা করে। আর লজ্জা করেছে বলেই আমার কর্তব্য বরুকে দিয়ে এটা শুধরে নেওয়ানো।"

"দাদু, এই 'কর্তব্য' শব্দটা আজ দ্বিতীয়বার শুনলুম, প্রথমবার শুনেছি পরিমল বেরার মুখ থেকে। হেনরি রেবেলোকে খাটো

করে বরুণ বসুরায় ওর কৃতিত্বটাকে নিজের বলে চালিয়ে দেওয়াতেই ওর মনে হয়েছে রেবেলোকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হল না। কী বলল জানো দাদু ? এক অ্যাথলিটের মর্যাদা অন্য অ্যাথলিট রক্ষা করবে, এটাই তো কর্তব্য। ভাবতে পারো !"

রাজশেখর কিছুক্ষণ কলাবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলেন, ভাবতে পারেন না।

"হ্যালো, স্পোর্টস ? বলদেবদা আছেন ? আমি কলাবতী বলছি।"

"কে, কলাবতী নাকি ? আমি ভবদা।"

"ওহ্হ্ ভবদা, কেমন আছেন ? একটা ব্যাপারে বলদেবদাকে ফোন করছি, উনি আছেন ?"

"এখনও ফেরেনি মাঠ থেকে। তা তুমি আর আসছ না কেন ? ভালই তো কাজ করছিলে, বাংলাটাও অনেক ইমপ্রুভ করেছিলে। রোজ না পারো মাঝে-মাঝে তো আসতে পারো, ফিচার-টিচারও তো লিখতে পারো। তা বলদেবকে কী জন্য দরকার ?"

"দরকারটা খুবই সামান্য। পরিমল বেরা নামে কোনও লোক পেপার কাটিং নিয়ে দেখাতে এসেছিল কিনা সেটাই জানতে চাইছিলুম।"

"আরে বরুণ বসুরায় নামে পুরনো আমলের এক অ্যাথলিট তো



ক'দিন আগে এটা নিয়ে আমায় ফোন করেছিল। কিন্তু কোনও পেপার কাটিং নিয়ে কেউ তো আমার কাছে আসেনি !"

"আসেনি। অথচ খুব বড় মুখ করে বলে গেল, এনে দেখাবে। লোকটা তা হলে দেখছি ধাপ্পা দিতে এসেছিল।"

"এই রকম অনেক লোকই আমাদের কাছে আসে। আসলে জেলাসি থেকেই ওরা এইসব বলে। মনুষ্য চরিত্র বোঝা বড় শক্ত, কলাবতী।"

"হ্যাঁ ভবদা, দু'দিনেই আমি সেটা একটু-একটু বুঝেছি। আচ্ছা, এখন আমি রাখছি, একদিন যাব।"

ফোন রেখে কলাবতী বিষণ্ণ মনে হাসল। কেন জানি পরিমল বেরাকে তার সাচ্চা মানুষ বলে মনে হয়েছিল। যখন বলছিল 'এটাই তো কর্তব্য', তখন ওর চোখে কেমন একটা আলো জ্বলে উঠেছিল। যেরকম আলো কলাবতী কখনও দেখেনি। গভীর অনুভব ছাড়া অমন আলো জ্বলতে পারে না। অথচ আজ আটদিন হয়ে গেল পরিমল বেরা বঙ্গবাণীতে যায়নি। ভবনাথদাই হয়তো ঠিক, মনুষ্য চরিত্র বুঝতে তার অনেক বাকি।

কয়েকদিন পর সুচরিতা এসে কলাবতীকে নিমন্ত্রণ করল। তার ভাইপোর অন্নপ্রাশন, দুপুরে খাওয়া। একমাত্র কলাবতী ছাড়া ক্লাসের আর কাউকে সে বলেনি। রাত্রে কলাবতী নিমন্ত্রণের কথাটা তুলে দাদু আর কাকার কাছে জানতে চাইল। "কী উপহার দেওয়া যায় বলো তো ? সোনার বালা কি আংটির কথা বোলো না। ওসব সেকেলে উপহার এখন চলে না।"

"একটা বারবি ডল কিনে দে।" সত্যশেখর মুহূর্তে সুপারিশ করে ফেললেন।

"পুতুলটুতুল ! ভেঙে ফেলবে দু'দিনেই।" কলাবতী নাকচ করে দিল।

"একটা সিল্ক কি গরদের ফ্রক।" রাজশেখর এমনভাবে বললেন যেন কেনা প্রায় হয়েই গেছে।

"ক'দিন আর পরবে ? দেখতে-দেখতে তো বড় হয়ে যাবে।"

রাজশেখরও নাকচ হলেন।

"তা হলে একটা ট্রাইসাইকেল।" দ্বিধাভরে সত্যশেখর প্রস্তাব দিলেন।

"ছ'মাসের ছেলে ট্রাইসাইকেল চালাবে ! বলছ কী ?"

ছেলেকে লজ্জিত হতে দেখে রাজশেখর এগিয়ে এলেন তাকে লজ্জামুক্ত করতে। "তা হলে প্যারাম্বুলেটর। সেটা তো ওকে চালাতে হবে না।"

"কলকাতায় এখন কেউ প্র্যাম ঠেলে না। রাস্তায় যা গর্ত, বাচ্চার হাড়গোড় আর আস্ত থাকবে না।"

"একটা ফার্স্ট এইড বক্স দিলে কেমন হয় ?" সত্যশেখর নড়েচড়ে বসলেন। "শুধু বাচ্চার কেন, বাড়ির লোকেরও কাজে লাগবে।"

রাজশেখর ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "তা হলে বরং গোটাচারেক বেবি ফুডের কৌটো দেওয়া..." নাতনির মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি থেমে গেলেন।

"এমন একটা কিছু বলো, যেটা দিলে সারাজীবন আমাকে মনে রাখবে।" কলাবতী অধৈর্য হয়ে বলল।

ওঁরা দু'জন চিন্তায় ডুবে গেলেন। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে ভয়ে-ভয়ে সত্যশেখর প্রায় দমবন্ধ অবস্থায় বললেন, "একটা কম্পিউটার ...না, না, না অনেক দাম, তার থেকে বরং একটা অভিধান দিলে কেমন হয় ? সারাজীবন বাচ্চাটার কাজে লাগবে, তোকেও মনে রাখবে।"

লাফিয়ে উঠল কলাবতী। "হাতে করে নিয়ে যেতেও আমার



সুবিধে হবে। কাকার ওরিজিনালিটির ধারেকাছে কেউ আসতে পারবে না, তাই না দাদু ?"

অবশেষে ইংরেজি থেকে বাংলা একটা অভিধান হাতে কলাবতীকে দেখা গেল অবিনাশ কবিরাজ লেন দিয়ে হেঁটে সুচরিতার বাড়ির দিকে যেতে। বাড়িটা সে চেনে। হাঁটতে-হাঁটতে একটা পানের দোকানে সার দেওয়া মহাদেব, কৃষ্ণ, হনুমান ও রামের ছবি দেখে তার ছবি বাঁধাইয়ের দোকানগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গে সে বলে উঠল, "আরে, চুয়াল্লিশের এফ-এ তো পরিমল বেরা থাকে ! একবার খোঁজ নিয়ে দেখলে কেমন হয় ?"

যেমন ভাবা তেমনই কাজ। খুঁজে বের করতে তার মোটেই অসুবিধে হল না। সুচরিতাদের বাড়ি ছাড়িয়ে দুটো মোড় ঘুরে একতলা চুয়াল্লিশের-ডি বাড়িটা। তারপর দোতলা একটা মাঠকোটা যার নম্বরের সঙ্গে রয়েছে ই এবং এফ। একপাল্লার টিনের দরজা দিয়ে ঢুকে সরু একটা পথ, যার দু'ধারে করোগেটেড টিন আর শালকাঠ দিয়ে তৈরি দুটো দোতলা বাড়ি। খোলা কাঁচা নর্দমা। ঘরগুলোর সামনে দড়িতে শুকোচ্ছে প্যান্ট, শার্ট, শাড়ি। রান্না হচ্ছে শোবার ঘরেই। কাঠের সোজা সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়।

কলাবতী ফাঁপরে পড়ল। কোন বাড়িটা 'এফ' ? একটি বউ তার ঘর থেকে উঁকি দিয়ে কলাবতীকে এতক্ষণ দেখছিল। এবার সে জিজ্ঞেস করল, "কাকে চাই আপনার ?"

"পরিমল বেরা, এফ বাড়িতে থাকেন।"

"ওই সামনের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায়, প্রথম ঘরটাই। সাবধানে উঠবেন।"

সিঁড়িটার একদিকে ধরার কাঠ খসে পড়েছে, একটা ধাপে

কাঠের পাটা নেই। দোতলায় পৌঁছেই দেখল সামনের প্রথম ঘরটার দরজা আধ-ভেজানো। পাল্লার ফাঁক দিয়ে কলাবতী পরিমল বেরাকে দেখতে পেল। তক্তপোশে চিত হয়ে পাঁজির মতো একটা বই পড়ছে। পরনে সবুজ চেক লুঙ্গি, খালি গা। কলাবতী দরজায় টোকা দিল। পরিমল উঠে বসল।

"আপনি!" তাড়াতাড়ি দড়িতে টাঙানো পাঞ্জাবিটার দিকে হাত বাড়িয়ে পরিমল বেরা আবার বলল, "বসুন।"

"বসতে আসিনি। শুধু একটা কথা জানবার জন্যই এসেছি।" কলাবতী তীব্র চোখে তাকাল। পরিমল বেরার অবাক ভাবটা তখনও ঘোচেনি। অস্ফুটে বলল, "কী কথা?"

"বলে এসেছিলেন পেপার কাটিং দেখাবেন, দেখিয়ে এসেছেন?"

পরিমল বেরা মাথা নাড়ল, "না।"

"তা হলে অত জোর দিয়ে বলে এসেছিলেন কেন? কোথায় সেই পেপার কাটিং? মিথ্যা কথাগুলো বলতে আপনার কি লজ্জা করল না? ভেবেছিলেন, আপনার মুখের কথা শুনেই বঙ্গবাণী লিখে দেবে, বরুণ বসুরায় বাহবা নেওয়ার জন্য হেনরি রেবেলোকে চিট্ করেছে।...আসলে আপনি একটা ঈর্ষাপরায়ণ, জেলাস লোক। বরুণ বসুরায়কে খাটো করার জন্য ধাপ্পা দিতে গেছলেন। এক অ্যাথলিটের মর্যাদা আর-এক অ্যাথলিট রক্ষা করবে, এটা কর্তব্য।...কর্তব্যের নমুনাটা তো খুব দেখালেন...আসলে আপনার মতো লোকেরাই স্পোর্টসের সম্মান নষ্ট করে, অ্যাথলিটদের মর্যাদা নষ্ট করে।" মেশিনগানের মতো কথার বুলেট ছুড়ে গেল কলাবতী। রাগে তার সারা শরীর কাঁপছে।

পরিমল বেরার লম্বা দেহটা কথায় ঝাঁঝরা হয়ে সামান্য নুয়ে

পড়েছে। চোখে-মুখে অসহায় লজ্জা।

"বলেছিলুম ঠিকই। কিন্তু কাটিং রাখা খাতাটা খুঁজে পেলুম না...এত বছর পর, কোথায় যে..." পরিমল বেরা ঘরের চারদিকে চোখ বোলাল। কলাবতীও ঘরটা দেখল।

কোনও কিছু হারিয়ে যাওয়ার উপায় নেই এই ঘরে। একটা কেরোসিন স্টোভ, হাঁড়ি, থালা-বাসন, হ্যারিকেন, মসলার কৌটো, জলের কলসি, গ্লাস ও বালতি ছাড়া আর কিছু নেই। এর মধ্যে কোনও খাতা লুকিয়ে থাকতে পারে না। তক্তায় একটা ওয়াড় ছাড়া তেলচিটচিটে বালিশ, সুজনি আর পাট করে রাখা মশারি। ওখানেও খাতা থাকলে খুঁজে পাওয়া যাবে।

পরিমল তক্তপোশের তলা থেকে একটা টিনের বাক্স টেনে বের করে ডালাটা খুলে দেখাল। "এর মধ্যে রেখেছিলুম।"

পাটকরা একটা ধুতি আর সাদা পাঞ্জাবি, ছোট কয়েকটা মোড়ক, পাকিয়ে রাখা কাগজ ছাড়া কলাবতী বাক্সে আর কিছু দেখতে পেল না।

"ঠিক সময়েই দেখছি আপনার জিনিস হারায়।" রাখঢাক না করেই কলাবতী কথাগুলোয় ব্যঙ্গের বিছুটি মাখিয়ে দিল, "অজুহাতটা ভালই দিলেন, হারিয়ে গেছে।"

যন্ত্রণায় পরিমল বেরার মুখটা কুঁকড়ে গেছে। নিরুপায় দুই মুঠি বুকের কাছে। "বিশ্বাস করুন, আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি কাউকে ছোট করার জন্য, কাদা ছিটোবার জন্য এসব বলিনি। সত্যিই রেবেলো সাড়ে আটচল্লিশ ফুট লাফিয়েছিল, বরুণ নয়।"

"এখন এসব বলে কী লাভ?"

"আমার কিছু বলার নেই। আপনার কথার জবাব দেওয়ার মুখ আমার নেই।" অপরাধীর মতো পরিমল বেরা মাথা নামিয়ে নিল।



"যেখান থেকে পারুন, লিখিত প্রমাণ এনে দিন।" কলাবতী দরজার দিকে এগিয়ে থমকে ঘুরে বলল, "সাতদিন অপেক্ষা করব, তার মধ্যে প্রমাণ না দিতে পারলে আপনাকে নিয়ে স্টোরি করব। বঙ্গবাণীতে ওটাই হবে আমার শেষ লেখা।"

কলাবতী সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে ঘুরে দাঁড়াল। ঘর থেকে পরিমল বেরা বেরিয়ে এসেছে। আবেগরুদ্ধ গলায় কলাবতী বলল, "জানেন, আপনাকে আমি বিশ্বাস করেছিলুম। আমার দাদু, কাকাও বিশ্বাস করেন। আপনি সব ভাল ধারণা ভেঙে দিলেন।"

সিঁড়ি থেকে নেমে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সে ওপরে তাকিয়ে দেখল বাজপড়া লোকের মতো পরিমল বেরা দাঁড়িয়ে।

"কলাবতী, হ্যালো, আমি বলদেবদা বলছি। আরে একটা মজার ব্যাপার...একটা চিঠি এসেছে দিল্লি থেকে। কে লিখেছে? ...পরিমল বেরা। পড়ে শোনাব?"

"পড়ুন।"

"চিঠিটা ক্রীড়া-সম্পাদককে লেখা। 'মাননীয়েষু, সাতদিনের মধ্যে প্রমাণ দাখিল করিতে না পারার জন্য আমি যৎপরোনাস্তি লজ্জিত ও দুঃখিত।' কলাবতী, বানান-টানানগুলো কিন্তু ফোনে আর বলছি না, বুঝে নিয়ো। হ্যাঁ, তারপর লিখেছে, 'লখনউয়ে দুইটি ইংরাজি, একটি উর্দু ও একটি হিন্দি কাগজের অফিসে গিয়াছিলাম। কিন্তু চল্লিশ বছরেরও অধিক কালের কাগজ ইহাদের

কাহারও কাছে পাইলাম না। তাহারা বলিল, দিল্লি গিয়া খোঁজ করিতে, সেখানে বড়-বড় কাগজের অফিস রহিয়াছে, হয়তো তাহাদের কাছে আটচল্লিশ সালের কাগজ থাকিতে পারে। তাই আমি দিল্লি আসিয়াছি। কিন্তু লখনউ ট্রায়ালের সময় এখানে বড় কোনও খবরের কাগজের অফিস ছিল না। একটি-দুটি যাও বা ছিল, তাহারা কাগজ উঠাইয়া দিয়াছে। একজন আমাকে একটি লাইব্রেরির কথা বলিল, যেখানে পুরাতন খবরের কাগজ রাখা আছে। টাকা দিলে নাকি সেখানে খবরের কাগজ হইতে ছবি তুলিয়া দেয়। আমি কাল সেখানে যাইব। ইতিমধ্যে দয়া করিয়া আমার সম্পর্কে কিছু লিখিবেন না। আমাকে আরও কয়েকটি দিন সময় দিন। আশা করি, আমার এই প্রার্থনা আপনি মঞ্জুর করিবেন। আপনি মহানুভব, তাই আশা করি কয়েকটা দিন ভিক্ষা নিশ্চয়ই দিবেন। নমস্কার জানিবেন। ইতি— আপনার বশম্বদ শ্রীপরিমলকুমার বেরা।' কলাবতী শুনলে তো ?"

"বলদেবদা আপনারা কী করবেন এবার ?"

"করব মানে ? কী আবার করব, এই পাগলের চিঠি কি রেখে দেব নাকি ? একটা তুচ্ছ সামান্য ব্যাপার নিয়ে লোকটা যে লখনউ-দিল্লি করবে কে জানত ! লোকটা সম্পর্কে তুমি ইন্টারেস্ট দেখিয়েছিলে বলেই ফোন করলুম। ভবদা তো চিঠিটা ফেলেই দিচ্ছিল।"

"পরিমল বেরা যদি প্রমাণ নিয়ে আসে ?"

"খেপেছ তুমি ! জীবনে আর বঙ্গবাণীমুখো হবে না। এসব লোক আমার জানা আছে।"

"যদি কোনও প্রমাণ পাঠায়, আমাকে কি একবার জানাবেন ?"

"জানাব।"

ওদের কথোপকথন ওইখানেই শেষ হল।



কলাবতীর স্কুল খুলে গেছে। পড়াশোনা নিয়ে সে ব্যস্ত। সাংবাদিকতা, বঙ্গবাণী, ময়দান, স্পোর্টস ডেস্ক—এসব তার কাছে এখন আবছা হয়ে আসছে। স্কুলে বড়দির সঙ্গে দেখা হলেই তার অস্বস্তি হয়, এই বুঝি ঝুপুকে স্টেফি গ্রাফ করে তোলার প্রসঙ্গটা উঠবে। কিন্তু ওঠেনি। অবশেষে একদিন সে বড়দির ঘরে গিয়ে নিজেই জিজ্ঞেস করল, "ঝুপুর বাবা-মার সঙ্গে আপনি কথা বলবেন বলেছিলেন।"

"বলেছি।" মলয়া মুখার্জি চিঠি পড়া বন্ধ করে গম্ভীর মুখটা তুললেন, "ওঁরা আর আমার মুখ দেখবেন না বলেছেন।... কিন্তু কালু, তুমি যা বুঝেছ সেটাই ঠিক। মন খারাপ কোরো না।" আবার তিনি চিঠি পড়া শুরু করলেন।

মনটা সত্যিই তার খারাপ হয়ে গেল। বড়দির সঙ্গে আত্মীয়-বিচ্ছেদ ঘটল তারই জন্য। তার চেয়েও খারাপ লাগছে, বাচ্চা ঝুপুকে একটা টেনিস রোবট বানাবার জন্য ওর বাবা-মায়ের হাস্যকর, অবুঝ এবং লোভী চেষ্টা দেখে।

রবিবার মাকার সঙ্গে ইভনিং শো-এ সিনেমা দেখতে গেছল কলাবতী। চার্লি চ্যাপলিনের 'গোল্ড রাশ'। বাড়ি ফিরতেই রাজশেখর জানালেন, "কালু, বঙ্গবাণী থেকে বলদেব ব্যানার্জি নামে একজন তোকে ফোন করেছিল। তোকে জানিয়ে দিতে বলল, ফর্টিএইট ওলিম্পিক ট্রায়ালের রেজাল্টের একটা ফোটোস্ট্যাট কপি ওরা ডাকে পেয়েছে। কোথা থেকে এসেছে সেটা ওরা জানে না। তবে একটা চিরকুট আঁটা ছিল, তাতে লেখা 'অনেক চেষ্টায় এইটুকুমাত্র জোগাড় করিতে পারিয়াছি।' তলায় নাম লেখা পরিমল বেরা।"

শোনা মাত্র কলাবতী আনন্দে চিৎকার করে উঠল, "ইয়াহ্। দাদু লোকটা কথা রেখেছে।"

রাজশেখরকে কিন্তু উৎফুল্ল দেখাল না। মৃদুস্বরে তিনি বললেন, "কালু, মুশকিল হয়েছে একটাই। ট্রায়ালে যারা নিজেদের ইভেন্টে প্রথম হয়েছে শুধু তাদেরই নাম ছাপা হয়েছে, তাতে হেনরি রেবেলোরও নাম আছে।"

"আর তার জাম্পের ডিসট্যান্সটা?" কলাবতী নিজেই যেন এবার লাফিয়ে উঠবে এমন ভাবে সে হাত মুঠো করে শরীরটা কুঁকড়ে স্প্রিংয়ের মতো গুটিয়ে নিল।

"নেই। কারও ডিসট্যান্স, টাইমিং কি হাইট, কিছুই নেই। শুধুই প্রথম হওয়াদের নাম।"

ধীরে-ধীরে আলগা হয়ে এল কলাবতীর শরীর। দু' চোখে ফুটে উঠল গভীর দুঃখ। শুধু বলল, "বেচারা!"

রাজশেখর বললেন, "তবু পরিমল চেষ্টা করেছে নিজের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য। দুঃখ করার কিছু নেই কালু, এটাই হল স্পোর্টসম্যানের কাজ।" নাতনিকে বুকে টেনে তিনি মাথায় হাত বুলোলেন।

"দাদু, কালই আমি পরিমল বেরার কাছে যাব। ওকে অপমান করে কথা বলে এসেছি, মাফ চাইব। ফোটোস্ট্যাটে রেবেলোর লাফাবার ডিসট্যান্স নাই থাকুক, আমি বিশ্বাস করি পরিমল বেরাই সত্যি।"

"বহু বছর ওকে দেখিনি, কাল ভোরে জগিং করতে-করতে আমরা দু'জনেই যাব।"

ভোরেই ওরা জগ করতে-করতে চুয়াল্লিশের এফ-এর সামনে পৌঁছল। টিনের দরজাটা খোলাই রয়েছে। এখানকার মানুষ ভোরেই উঠে পড়ে কাজে বেরনোর জন্য। রাজশেখরকে দেখে একতলায় লোকেরা অবাক হয়ে গেল। এই ধরনের চেহারার মানুষ মাঠকোটায় কখনও আসেনি।



"দাদু, তুমি আর উঠো না, আমি ওকে ডেকে আনছি।" এই বলে কলাবতী সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

পরিমল বেরার ঘরের দরজাটা খোলা। কিন্তু কী আশ্চর্য, ঘরে যে একটা বউ! তক্তপোশটায় একটা বাচ্চা কাত হয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘরে কিছু জিনিসপত্রও রয়েছে। স্টোভে ভাত ফুটছে। ঝাঁট দেওয়া বন্ধ রেখে অবাক হয়ে বউটি তাকিয়ে।

"এখানে পরিমল বেরা থাকেন না?"

"থাকত, এখন আর থাকে না।" বারান্দায় উবু হয়ে বসে আঙুল দিয়ে দাঁত মাজছে যে লোকটি, সে-ই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ঘরটা আমাকে দিয়ে গেছে। পরিমল বেরাকে কী দরকার, টাকা ধার করেছিল?"

"না, ধার করেনি, তবে আমার ওকে ভীষণ দরকার।"

"ছবির ফ্রেম করতে দিয়েছিলেন? কিন্তু দোকান তো বেচে দিয়েছে।"

"সে কী?"

"কী একটা খুব জরুরি কাজে ধারধোর করে লখনউ গেল, আমার কাছ থেকে নিয়েছে দেড়শোটা টাকা। বললুম, কী এমন জরুরি কাজ পরিমলদা? বলল, সে তুই বুঝবি না। তারপর ক'দিন বাদে ফিরে এসে বলল, কাজ হয়নি, দিল্লি যেতে হবে। দোকানটা বেচে টাকা নিয়ে দিল্লি সেই যে গেল তো গেলই, আর ফিরে আসেনি। বুড়ো বয়সে কী যে ভীমরতি ধরল, দোকান কি কেউ বেচে?"

"কোথায় ওকে পাব, বলতে পারেন?"

"না।" লোকটি ঘরে ঢুকে গেল।

অসাড় মাথা নিয়ে এক-পা এক-পা করে কলাবতী নীচে নেমে এল।

"কী হয়েছে কালু, পরিমল..." রাজশেখর নাতনির মুখ দেখে ব্যস্ত স্বরে বললেন।

"এখানে আর থাকে না। ... চলো দাদু।"

ধীরে-ধীরে জগ করে ছোটার মধ্যেই রাজশেখর আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন, কলাবতীর চোখ দুটি জলে ভেজা, ছলছল দৃষ্টি।

"কালু, তোর কী হল ? চোখে জল !"

"দাদু, আমার আনন্দ হচ্ছে। কী যেন হারিয়েছিলাম। মানুষকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এখন আবার পারছি।"

www.boiRboi.blogspot.com

# সবিনয়ে নিবেদন

হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ এই লাইব্রেরিটি ৫ম মাসে পদার্পন করল। বইয়ের সংখ্যাও ২০০ অতিক্রম করেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই সাইটের জন্মলগ্ন থেকেই শুভানুধ্যায়ীর অভাব ছিল না। তাদের প্রবল উৎসাহ আমাকে প্রবলবাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি কঠিন আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়ে সময়টা অতিক্রম করছি,কিন্তু পাঠকের উৎসাহ দেখলে আমি সব কষ্ট ভুলে যাই।

আমার মূল উদ্দেশ্য যত বেশি সংখ্যক বাংলা বই  অনলাইনে নিয়ে আসা। মূর্চ্ছনা এই দিক থেকে অগ্রগামী,তাদের বইয়ের আমি বড় ভক্ত। তবে বিভিন্ন কারনে তারা অনেকদিন নিয়মিত বই দিচ্ছেন না,তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার সাইটের অনেক পাঠক মূর্চ্ছনার খোঁজ রাখেন না,তাদের জন্যই মূর্চ্ছনার কথা বললাম। আমি মূলত মূর্চ্ছনার সাথে মিল রেখে বই আপলোডের চেষ্টা করি,তাদের যে বইগুলো আছে,সেইগুলো আমি দিতে চাই না।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয়। অনেকেই আমার সাইটের এ্যাডগুলো ব্রাউজ করেন,কিন্তু সঠিকভাবে না করার ফলে আমার খুব বেশি লাভ হয় না। আমি একটু গাইডেন্স দিই,কিভাবে ব্রাউজ করলে আমি উপকৃত হব।

যে লিংকটা ওপেন করবেন,সেটা ওপেন হলেই ক্লোজ করবেন না। বরং সেই সাইটের বিভিন্ন লিংকে যান,এবং এভাবে ২০-২৫ মিনিট অতিবাহিত করুন। পারলে আরও বেশি সময় সাইটটি খুলে রাখুন। তবে মাসে একবারের বেশি ব্রাউজ করার দরকার নেই। বাংলাদেশ থেকে যারা ব্রাউজ করেন,তারা ২ মাসে একবার ব্রাউজ করবেন। আর উপমহাদেশের বাইরে যারা আছেন,তারা মাসে ২ বারও করতে পারেন,সমস্যা নেই।

আপনাদের সাজেশন,অনুরোধ আমার একান্ত কাম্য। কোনও সংকোচ না করে আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলতে পারেন,বইয়ের অনুরোধ জানাতে পারেন,আমি খুশি হব।

শেষে একটি কথা,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার। আমার একটি মোবাইল জাভা সফটওয়্যার ২ লক্ষ্যের বেশীবার ডাউনলোড হয়েছে,এখনও হয়ে চলেছে। আপনারা যারা জানেন না,তারা মোবাইল ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি টা ট্রাই করতে পারেন। www.getjar.com এ গিয়ে সার্চ বক্সে Bangla লিখে সার্চ দিলে দেখবেন Bdictionary চলে এসেছে। আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

বইয়ের আলোকে আলোকিত হোক আমাদের জীবন।

E-mail: ayan.00.84@gmail.com
Mobile: +8801734555541
+8801920393900